পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা - ৭০০০৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপাটমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী
২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা - ৭০০০৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Emai :bbt_sukchar@yahoo.co.in
Website : www.avinabadarshan.com

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

এই মহাসৃষ্টির জলে স্থলে অজস্র কোটি জীবজন্তু জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক একবার বিভিন্নরূপে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। এই যে জীবজগৎ বিভিন্নরূপে আসছে, সেই রূপটা অর্থাৎ সৃষ্টিটা পাত্র বুঝে হয়। পাত্র যেইভাবে গড়া, সেই আধার অনুযায়ী সৃষ্টির রূপটা হয়ে যাচ্ছে। জন্মমৃত্যুর ধারাপাতার ধারায় এমন কিছু আছে যে, বিভিন্নরূপের অদলবদল হয় এই পাত্র অনুযায়ী।

এটাই আমাদের প্রথম জীবন নয়। তার আগে লক্ষ জীবনের মধ্য দিয়ে এসেছি। আর এই পাত্রের মধ্যেই মাত্রাভেদে কখনও মশা মাছি, কখনও কাক শকুন, কখনও কুকুর বিড়াল, কখনও বা মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছি আর মরছি। আবার এই বিবর্তনের মধ্যে কোন্ জন্মটায় কোন্ জীব শ্রেষ্ঠ, কোন্ জীব নিকৃষ্ট, তা বলা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি জীব প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার থেকে অসীম ক্ষমতা নিয়ে এসেছে। তাই প্রকৃতির দরবারে প্রত্যেকটি জীবের সমান অধিকার।

প্রতিটি পাত্রের মাত্রা অনুযায়ী birth (জন্ম) হয়। এই মাত্রা যেকোন সময় উঠানামা করতে পারে। যদি জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে বিশ কোটি মাত্রা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মাত্রা জয় করতে না পারা যায়; অর্থাৎ বিশ কোটি মাত্রার ঊর্দ্ধে উঠা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিশ কোটি স্তরে উঠানামা করতে হবে। বিশ কোটি মাত্রার বিশ কোটি চেহারা (রূপ); আর এই বিশ কোটি মাত্রার চেহারার মধ্যে আমরা কেবল ঘুরছি।

আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মাত্রা বাড়াতে না পারবো, মাত্রাজ্ঞানে যতক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারবো অর্থাৎ বিশ কোটি মাত্রার ঊর্দ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত যেতে না পারবো, ততদিন জন্মমৃত্যুর ছকে বারবার আমাদের যাওয়া আসা করতে হবে।

মাত্রায় উঠতে গেলে স্বচ্ছতায় ভরপুর হতে হবে। প্রকৃতির ধারাপাতার ধারায় ভরপুর হতে হবে। জীবনভর তীর্থ করলে, দানধ্যান করলে; এইগুলিতে মাত্রার কোন বেশীকম হয় না। যে প্রকৃতির সুরের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে পারবে, একমাত্র সে-ই মাত্রাজ্ঞানের ঊর্দ্ধে উঠে পরমানন্দের সুরে বিচরণ করতে পারবে, যেখানে জন্মমৃত্যু ইচ্ছাধীন।

জন্মমৃত্যুর ছকে জীবকে যাতে বারবার না পড়তে হয়, তারজন্য এই ছক থেকে জীবকে উদ্ধারকল্পে কৃপাময় জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সবাইকে সতর্ক করে বললেন, ''তোমরা এখানে যা কিছু গ্রহণ করতে চাও, যা কিছু আকাঙ্খা করছো, একটা আকাঙ্খাও তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হবে না। টাকাপয়সা চাও, বাড়ী গাড়ি জমি চাও, প্রাসাদ চাও, সমাজে স্থান চাও, প্রতিষ্ঠা চাও; যা তোমরা চাও সুখে থাকার আশায়, যত কামনা বাসনা পরিপূরণের আশা তোমরা এখানে করছো, একটা বাসনাও এখানে পরিপূর্ণ হবে না; সবই সাময়িক। এগুলো কিছুই তোমাদের সঙ্গে যাবে না। যশ-মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনকিছুই সাথে যাবে না। মনে রেখো, সবটাই সাময়িক। তাই তোমাদের মাত্রাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।''

মাত্রাজ্ঞানে যাতে জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তারজন্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন প্রকাশনে'র** উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন প্রকাশনে'র ২৩-তম** শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল, **'পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান'**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী, শ্রী উত্তম চ্যাটার্জী, শ্রী সুজয় চ্যাটার্জী, শ্রী তপন গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী অণিমা গাঙ্গুলী। এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫ — *চপল মিত্র*

ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

আমরা যে নড়াচড়া করছি, এটা রিলের গতি অনুযায়ী, পাত্র অনুযায়ী সাড়া দিয়ে যাচ্ছি

পাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

বস্তুর গতি কিভাবে আসে, সেটা একটু জানা ভাল। সৃষ্টি যে হয়, বস্তু হতেই হয়। যে পাত্রটি থাকে, তা হতেই সৃষ্টি হয়। তবে পাত্র হতে সৃষ্টি হয়, বলাটা ঠিক হবে না। পাত্র অনুযায়ী সৃষ্টি হয়। **সৃষ্টির নিয়ম হল, পাত্র যেইভাবে গড়া, সেই নিয়ম অনুযায়ী তৈরী হতে থাকে। গাছের একটা বীজ পুঁতে দিলে, বীজ হতেই গাছ হয় না। বীজ অনুযায়ী গাছ এল। বীজ এমন একটি পাত্র, যেই পাত্র দিয়ে আসবে।** জীবনের যাত্রাপথে যতগুলি সৃষ্টি আছে, সেইসব বিষয়বস্তু হতে কি সৃষ্টি হয়? ঠিক তা নয়। সৃষ্টিটা পাত্র বুঝে হয়; অর্থাৎ পাত্র যেরকম থাকে, সেই আধার অনুযায়ী সেই পথ ধরতে থাকে। একটা কুমড়োর বীজ বপন করা হল। বীজ থেকে পাতা বের হল। বীজ অনুযায়ী ফুল হল, ফল (কুমড়ো) হল।

এই শূন্য হতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কোন পাত্র খালি থাকবে না। এটাই শূন্যের নিয়ম যে, কোন পাত্র খালি থাকবে না। শূন্যে আবার ঐ আধার অনুযায়ী ভরতে আরম্ভ করবে। যখনই একটা কিছুর নাম থাকবে, কোন খালি পাত্রের নাম, সেই অনুযায়ী, ঐ পাত্র অনুযায়ী ভরতে আরম্ভ করলো, ভরতে লাগলো। শূন্যের থেকেই খালি জায়গা ভর্ত্তি হচ্ছে। ঐ অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টি হলো, গ্রহ আসলো। যখন পৃথিবী এলো, ঐ পাত্র অনুযায়ী প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম— ঐ পাত্রের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তারা ঐ পাত্র অনুযায়ী বয়ে যেতে আরম্ভ

করলো। ঐ পাত্রের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার জন্যই গাছ-গাছড়া, ফুল, ফল হচ্ছে সৃষ্টির নিয়মে। মহাশূন্য অসীম বা তার শেষ নেই বলে কেন? বলে এর জন্য। যখনই পাত্র থাকবে, তাহা হতে বের হতে থাকবে। রূপের পর রূপ বেরিয়ে যাওয়ার নিয়মে বেরিয়ে যাচ্ছে। পাত্রের জল ঢাললে শেষ হবে। কিন্তু এমনি জল শেষ হবে না। শেষ না হওয়ার পথ দিয়ে পাত্রগুলি এমনভাবে তৈরী হতে থাকে সৃষ্টির নিয়মে। একটা পাত্র হতে যে আরেকটা পাত্র গড়ছে, তার ভিতর হতে যে আর একটা তদনুযায়ী পাত্র গড়ার সবকিছু নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে, ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকটি পাত্রের ভিতর দিয়ে তদনুযায়ী আর একটা পাত্র গড়ে যাচ্ছে। এই যে গড়ে যাওয়ার পদ্ধতি, এটা শূন্য হতে আসছে। **এই শূন্য হতেই বস্তু পূর্ণতা লাভ করছে আবার শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ঐ শূন্যটা এক একটি পাত্রে রূপ নিয়ে পূর্ণই হচ্ছে। শূন্যের মাঝে বাতাসে রূপে ভরে যাওয়াটাই পরিপূর্ণতা।**

সৃষ্টির নিয়মে যেকোন বিষয়বস্তু পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে নানা রং বেরং-এর মাধ্যমে বস্তুর রূপের ভিতর দিয়ে। এই জগতের যে কোন বিষয়বস্তুই কোন না কোন পাত্রের ভিতরে থাকে। ধরা যাক, কুমড়ো বা লাউ বীজ। মাটিতে বীজ যেই পুঁতলে, ক্রমে ক্রমে এতবড় গাছ হলো লতায় পাতায় ফুলে ফলে ভরে গেল। এতবড় গাছ ঐ ছোট্ট বীজের ভিতরে থাকে কি করে? বীজ হতেই গাছ হলো, পাত্র অনুযায়ী। ক্ষীর দিয়ে যেমন সাজ করা যায়। তারপর ঐ সাজে ফেলে ফেলে নানারকম মিষ্টি, সন্দেশ ইত্যাদি তৈরী হয়। সব ঐ পাত্র অনুযায়ী, সাজ অনুযায়ী বের হচ্ছে। এই যে পৃথিবীর পাত্রটা খালি ছিল, শূন্যের ভিতর ছিল তো। ঐ পাত্র অনুযায়ী শূন্যের ভিতর থেকেই নানা জিনিস সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। শূন্যের স্বাভাবিক ধর্ম হলো শূন্যে মিশিয়ে দেওয়া। শূন্য কোন আকার নিয়ে থাকতে চায় না। আকার যা হচ্ছে, আবার শূন্যে মিশে যাচ্ছে। এই ফাঁকা জায়গা যে দেখছো, **এই ফাঁকা সীমাহীন, অসীম, অনন্ত। কোন আকারেই শূন্যকে বেঁধে রাখা যায় না। জল বরফ হয়ে গেলেও গলে যেতে চায়। বরফের আকার নিলেও জল তার নিজস্ব সত্তায় থাকতে চায়। ওর ধর্মই গলে যাওয়া।** ওকে কিছুতেই রাখা যায় না। বরফ হয়ে জমাট যে হলো, আজ হোক, কাল

হোক, গলবেই। এই জগৎটা শূন্যের থেকে বরফের মতো জমাট আকার নিল, একটা আকার ধারণ করলো। তা হতে আর একটা আকার বের হলো। এইভাবে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা চললো অনন্তকাল ধরে। যে বীজটা পুঁতলে, তা থেকে লতা হয়ে, গাছ হয়ে বের হলো। তা থেকে আবার বীজ। আকারের পর আকার গড়তে গড়তে শেষ বেলায় আবার আকারবিহীন হতে চেষ্টা করে। আঁকার ভিতর দিয়ে গিয়ে পরে আবার ফাঁকার মাঝে, শূন্যে মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তারজন্যই কোন কিছুরই সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না, শেষ পাওয়া যায় না। না পাওয়ার কারণ হল, শূন্যের থেকে যার যার রূপ নিয়ে নিয়েছে। সেই রূপ রূপান্তরিত হতে হতে শূন্যেই মিশে যেতে চাইছে।

শূন্য হতে রূপ নেওয়ার ফলে, তা থেকে আর একটা রূপ বের হলো। অনন্তকাল এই চলেছে। রূপগুলো কেন বের হচ্ছে? মিলতিতে মিশবার জন্য। ওর ধর্ম হল, যতক্ষণ না শূন্যে মিলবে, চলছে ওর গতি অনুযায়ী। এটাই Motion (মোশন), স্পীড। এই স্পীডটাই হল প্রাণ। এই যে জীবকুল নড়াচড়া করছে, আমরা জীবনযাত্রায় যে চলছি, এটা চিত্রজগতে রিলের মোশনের ন্যায় নড়াচড়া। আমরা যে নড়াচড়া করছি, এটা রিলের গতি অনুযায়ী, পাত্র অনুযায়ী সাড়া দিয়ে যাচ্ছি। এই যে দেখছো, দেখা ক্রিয়াটা, কে দেখছে? এই যে শুনছো, শুনতে পাওয়াটা, কে শুনছে? পাত্র অনুযায়ী ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। যে পাত্র ছিল শূন্য হতে ভরপুর করে দেবার জন্য, ভরে দেবার উদ্দেশ্যে এমনভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে। তারজন্যই তোমরা চোখে দেখতে পাচ্ছ, কানে শুনতে পারছো; ভরপুর করে দেবার উদ্দেশ্যেই শুনতে পাচ্ছ। এতে ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে মহাশূন্যের ফাঁকা জায়গার জিনিসই পরিস্ফুট হচ্ছে। তোমার পাত্র অনুযায়ী ফাঁকা জায়গার উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবার জন্য তুমি পূর্ণের পথে চলেছো।

মিলিটারীরা তোমার সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট করে না। **এই যে মিলিটারী বনজঙ্গল পরিষ্কার করে শহর করে, মিলিটারীরা চলে যাওয়ার পর আমরাই সেগুলো ভোগ দখল করি। সেরকম আমরা রিফিউজির মতো কানটা দখল করে শুনছি, চোখটা দখল করে দেখছি।** এই যে এগুলো

হচ্ছে, আমাদের ব্যক্তিগত কারণে নয়। গতি অনুযায়ী রূপগুলো বার হচ্ছে, অগ্রসর হচ্ছে, মিশে যাওয়ার পদ্ধতি অনুসারে মিশবার জন্য চলছে। পুনরায় যেন মিশিয়ে নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই চলেছে। ক্রমাগত রূপের পর রূপ বার হয়ে যাচ্ছে। চোখে দেখে মাথায় বুদ্ধি খুলতে খুলতে ভরপুর করার সহযোগিতা আরও বেশী হয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তা আপনি পরিস্ফুট হতে থাকে। ছোলাগুলো সব ভিজিয়ে নিয়ে ছোলাওয়ালা পথ চলেছে। দু'দিন পথ চলার পর দেখে সব ছোলা থেকে গাছ বেরিয়ে গেছে। কাজেই এ ব্যাটাও পথ করতে গিয়ে দেখে সব ফুটে গেছে। 'ও' নিজেও বুঝে না যে, এইরকম হতে পরে। পরিপূরণের উদ্দেশ্যের গতিই এরকম হতে পারে। পরিপূরণের উদ্দেশ্যের গতিই এরকম জ্বলন্ত অবস্থায় থাকতে পারে। হাতও যদি দ্রুতগতিতে ঘোরাও, তবে জ্বলতে থাকবে। যেকোন জিনিস দ্রুতগতিতে চললে আলো জ্বলবে। এই যে শূন্যে সব কিছু পূর্ণবেগে চলছে; কেন চলছে? ফাঁকা জায়গাটা স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে। ফাঁকা জায়গার স্বাভাবিক গতিই ফাঁকা। কার গতি ফাঁকা জায়গায় না আছে? আমরা খালি জায়গায় দেখতে পেতাম না, যদি ঐ গতি অনুযায়ী না চলতাম। তুমি যে দেখতে পেলে, তাতে পরিপূর্ণতার সহযোগিতা হচ্ছে।

যখনই 'খালি' বলে ব্যবহার করবে, 'ফাঁকা' বলে, 'শূন্য' বলে, 'কিছুই নাই' বলে ব্যবহার করবে, এই শব্দগুলি ব্যবহার করার মানেই হচ্ছে এই ব্যাবহারিক জগতে তোমার সঙ্গে ঐ সত্তারই ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে, যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আকাশে বাতাসে শূন্য হতে যে এত রূপ নিতে পারে, শূন্য নিজেও অবাক হয়ে গেছে। এই যে এত রূপের সমাগম, এ যে অদ্ভুত; জলে স্থলে ফাঁকায় যে এতরূপ নিতে পারে, সে নিজেও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। সবাই আকাশের দিতে তাকাচ্ছে, এ কি ব্যাপার। তখনই চক্ষু, কর্ণ বুদ্ধি জোগাতে আরম্ভ করলো, কিভাবে আমরা খুঁজে পেতে পারি। পরিপূর্ণতার জন্যই চোখ, কান, নাক গজালো। পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যেই আমাদের দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়গুলি গড়া। পরিপূর্ণ করার জন্যই এই যন্ত্রগুলি এমনভাবে তৈরি হয়েছে। আমরা জীবনে সবাই সেইভাবে সেই উদ্দেশ্যেই যেন যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করে চলেছি। চিঠি

লেখার মাধ্যমে, খাওয়ার মাধ্যমে, বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরী করার মাধ্যমে, এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন, হাজার হাজার লাইন — সবটাতেই মনে হয়, খালি জায়গায় তৈরী করার মনোবৃত্তি গজাচ্ছে। **এই যে একঝুড়ি একঝুড়ি করে মাটি ফেলে পাহাড়ময় করে ফেলছে, আমরাও তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে, তিল তিল করে প্ল্যান করছি কিভাবে ছলে বলে কৌশলে যাবতীয় অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করা যায়।** সেইভাবেই আমরা চলছি। সেই পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যেই গড়া এই দেহ। বাস্তব জীবনের কত প্রয়োজনীয়তা আমরা নানাভাবে মিটাবার চেষ্টা করছি। সেই অনন্ত চেষ্টার প্রচেষ্টায় আমরা যদি চেষ্টা করি, ঐ দিকটা যদি খেয়াল করি, তবে পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে যে, এই দেহ গড়ে উঠেছে, তা আমরা জানতে পারবো।

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী দেহমনপ্রাণ গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকের ভিতর এমন পাত্র রয়েছে। এই পাত্র (দেহবীণাযন্ত্র) কি করে জান? সমস্ত বিশ্বের সত্তাকে সে জানাতে পারে, এমনভাবে গড়া আছে। আবার সমস্ত জগতের সাথে এক হয়ে, লীন হয়ে যাতে মিশতে পারে এই দেহ, সেইভাবে সুর বাঁধা আছে। আমরা যদি সেই সুরে এগিয়ে যেতে পারি, তবেই পাব সেই পরম সুরের সন্ধান। সেদিন যে আজ্ঞাচক্রের কথা বলেছি, সেই সাধনায় যদি সব সময় ব্যস্ত থাকি, সেই অপূর্ব ধ্বনি যা বাহির হতে শুনা যায় না, আর কেউ শুনতে পায় না, সেই অপূর্ব ধ্বনির সুরে তোমার ভিতরে এমন সাড়া দিতে থাকবে যে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তুমি তোমার ভিতর হারিয়ে যাবে। তুমি যে আছ সেই কেন্দ্রে, শুধু এটুকুই বুঝে নাও, তুমি তার মধ্যেই আছ। তুমি যে আকাশের নীচে, তুমি যে মাটির ধরায় আছ, তা জানতে মনস্থির করতে হবে না। আর সেইভাবেই চিন্তা করো যে, তুমি ভরপুর অবস্থায় আছ। এটা দেবতার যন্ত্র। সমস্ত যন্ত্রই দেবভাবের। দেবতা হয়ে যাতে গড়ে উঠে, অপূরণকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে যাতে পূর্ণ সত্তা হতে পারা যায়, যাতে পূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠে, সেই ব্যক্তিত্ব থেকে এটা তৈরী। জপ, ধ্যান যে সবসময় করতে হবে, তা নয়।

সবসময় কি হচ্ছে? জল উপরে উঠছে। আগুন উপরে উঠছে।

তোমার মাথার উপরে আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, অগণিত গ্রহ উপগ্রহ দেখতে পাচ্ছ। এ সবই বাহ্যিক; বাইরের দৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু দেহের অন্তর্নিহিতে কোন উপর নীচ নেই। তোমার দেখার সাথে সাথে ভিতরের চক্রের ক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে তুমি সূর্যে ডুবলে, ক্ষণে চন্দ্রে ডুবলে, ক্ষণে আকাশে ডুবলে। চোখের গতি নীল আকাশের দিকে চলে যায়। আমরা বলি আকাশ নীল। আকাশের রং নেই বলেই নীল রং। আকাশের রং নেই বলে লালও তো হতে পারতো। সেই রং তোমার কাছে এসেছে, সেই রঙে তুমি গড়া বলে। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র সেই নীলাকাশের সঙ্গে নিজেদের এক রং করে নিয়েছেন। সহস্রার নীল মানে বিরাট সত্তা। অদ্ভুত নীলাভ ভাব সবসময়। মাথার চুলগুলি কুচকুচে কালো। সাধারণতঃ অনন্ত বিশ্ব হতে এই রং আহরণ করেছে। **এই লোমকূপগুলি বিশ্ব হতে শক্তি আকর্ষণ করছে। চুলের মধ্যে এমন আকর্ষণ শক্তি আছে, সাংঘাতিক চুম্বক আছে। এতগুলি চুম্বক তোমার মাথার মধ্যে বাঁধা কেন? সহস্রারকে আকর্ষণ করবার জন্য** সহস্রার শক্তি অগণিত শক্তিতে বাঁধা। এই যে চুলগুলি দিয়েছে শুধু কেটে ফেলবার জন্য নয়; শুধু শোভা বর্ধন করবার জন্য নয়। আকাশে বিন্দুগুলিকে মনে হয় ফাটা ফাটা, মাটি যখন ফাটে, তখন যেমন ফাটাফাটা, গাছের পাতার শিরাগুলি ফাটা ফাটা হয়ে যাচ্ছে। চুলগুলি আকর্ষণ করে রাখছে। চোখে টেনে আনে। রক্ত টেনে আনে। বুদ্ধি হতে মন দিয়ে যাতে তাদের আটকিয়ে রাখা যায়, তারজন্য টানছে। টেনে যাতে রাখতে পারে, তার চেষ্টা করছে। যত কয়েল বাঁধা যায়, তত টানে। নখগুলোও টানে। এই নখ শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয়। তোমাকে সমস্ত বিষয়বস্তুর টানে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। তাই বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে টানে। সাধুরা যে বড় বড় নখ চুল রাখছে কেন? তারা সমস্ত সত্তাটাকে টানছে। একটা আকর্ষণ হয় স্বাভাবিকভাবে। আর একটা আকর্ষণ হয় বুদ্ধি দিয়ে। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে একটা আকর্ষণ চলতে থাকে। দেখ না, সব জায়গায় বিদ্যুতের খেলা কিভাবে চলছে। দুটো তারের টানাটানিতে ফ্যান ঘুরছে। আমাদের ভিতরে যে অগণিত তার, তার কাছে এগুলি একটা শিশু।

আমাদের মধ্যে অনন্ত বিশ্বের বিদ্যুৎকে আটকাতে চেষ্টা করছে।

ঐ বিদ্যুৎকে এই যন্ত্রই দেহযন্ত্র আটকাতে পারে। এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভ, তার আছে, চিন্তা করা যায় না। দেহের ভিতর ব্যাটারি আছে। সমস্ত দেহ একটা ব্যাটারি, সমস্ত বিদ্যুৎকে টেনে রেখেছে। কিন্তু আমরা মানছি না। সৃষ্টির সমস্ত মালমশলা ভরে দিয়েছে আমাদের মধ্যে। ভিতরে এরকম শক্তি রয়েছে, সেই শক্তি যার কণিকাতে কণিকাতে কোটি কোটি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এইটুকু দেহযন্ত্রে সব আটকিয়ে রেখেছে। আমরা এই শক্তিটাকে ব্যবহার করছি অন্যভাবে। কাজেই শক্তিটাকে মন্ত্রে আটকাতে হবে। তুমি সুইচ্‌টা দেবে কোথায়? মন্ত্রটা যখন সুরে আনয়ন করলে তখনই সুইচ্ দেওয়া হ'ল। মন্ত্রই হচ্ছে গর্জন। তুমি জপ করছো, কাজ হয়ে যাচ্ছে। তুমি আকাশ চিন্তা করছো, সূর্য চিন্তা করছো; তুমি গুরু চিন্তা করছো, তখন যন্ত্রগুলি দেখবে যে, এতদিনে তাদের কাজে লাগাচ্ছ। তখন যন্ত্র শুরু করেছে কাজ করতে।

কেউ যদি বলে, 'একটি দেশলাই, কাঠি খুঁজতে হবে, হাতী নিয়ে আস তো।' একটা দেশলাই কাঠি খুঁজতে কেউ হাতী ভাড়া করে আনে না। এটা শুনতে যেমন হাস্যকর, এখানে আমরা যা কিছু করছি, সব ঐ রকম হাস্যকর। **আমাদের এখানকার সব কাজ ঐ হাতি দিয়ে দেশলাই কাঠি খুঁজবার মতো। আর যন্ত্রের ঐ কাজ, তুমি যখনই আকাশ চিন্তা করছো, সহস্রার ফুটতে আরম্ভ করলো।** এখন শীতকালের সুন্দর আকাশ। দু'মাস পরেই দেখবে হঠাৎ মেঘ আসতে শুরু করেছে। তবে মাঘ মাস থেকেই যদি কোথায় মেঘ, কোথায় মেঘ, করতে থাকো, তাহলে কি করে হবে? যেই চৈত্র মাস আসলো, আমের কুসিও শুরু হলো, জলও আরম্ভ হলো। মেঘ, ঝড়, ঝাপ্‌টা — শুরু হলো বর্ষা। তারপর শরৎ, তারপর হেমন্ত। এভাবে পরপর আসতে থাকে। কিন্তু হেমন্তকালেই যদি বলতে থাকো, 'শ্রাবণ, ভাদ্র আর কৈ আসলো নাতো?'

তুই তো চৈত্রমাসে আছিস। কোনটা ফাল্গুন মাস, কোনটা চৈত্র মাস, স্বাভাবিকভাবে আসবে তো। পৌষমাসে দারুণ শীত, হি হি— একটা কম্পন। কই, তুই তো এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলি, 'জল দাও'— গরমের জন্য। আবার এখানে দাঁড়িয়ে বলছিস্ 'কাঁথা দাও'। আবার বর্ষার সময় ঝড়বৃষ্টিতে

ভিজে যাচ্ছিস্, 'ছাতা দাও।' কাজেই **স্বাভাবিকভাবে যা হচ্ছে, সেটাকেই মেনে নিতে হয়। এর মাঝে নিজের মাতব্বরি করতে যাওয়া মানেই হুঁচোট খাওয়া।**

আমাদের মন এখন নানা জায়গার নানা কথায় আছে। কিন্তু সব কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারের ধ্যানে তন্ময় হয়ে যাও, তাহলে নিজের ভিতরে সুরের মূর্চ্ছনায় কস্তুরী মৃগের মতো আনন্দে উন্মাদ হয়ে বলবে, 'কৈ পাচ্ছিনা তো।' তারপর আসল জায়গার কথায়, আসেন তো দেখেন তো, ধাক্কা দিয়ে দেখাতে হচ্ছে, ঠিক আছে কিনা। তারপরের মাসে যখন এল, ছেলে চক্ষু বুঁজে বসে আছে।

বাপে কয়, চোখ খোল।

ছেলে বলে, 'এখানকার কিছু দেখতে ইচ্ছা করে না।' এখানকার দেখাটাকে ঘৃণা মনে করছে। দেখে, ময়লা সব। চোখের সামনে যদি ময়লা থাকে, চোখ মেলে চাইতে ইচ্ছা করে না। এখানকার সব কাজ, এই কাজই শেষ নয়। তোমার যন্ত্র তৈরী। যা দেখতে পাচ্ছে, তার কাছে এখানকার সব ছোট হয়ে গেছে।

আরে 'তাকা, তাকিয়ে দেখ,' বাপ বলছে। তাকালে ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার যে আসল কাজ আছে, তার ক্ষতি হয়। দেখ, শহরের আট মাইল আর গ্রামের আট মাইল, দূরত্বের দিক থেকে একই। কিন্তু গ্রামে আট মাইল যেতে হলে এদিক ওদিক বসছে, গাছতলায় বসছে, পথ আর শেষ হয় না। আর এখানে শহরের আট মাইল বাড়িঘর দেখতে দেখতেই কেটে যায়।

আমরা সুন্দর পথের পথিক। এখানের কাজগুলো করার প্রয়োজন হলো, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করার নমুনা স্বরূপ এগুলো দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই জগতের এইসব নিয়েই মেতে থাকো। এই জগৎ তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নমুনা স্বরূপই এইটুকু দেন। তোমরা কিভাবে এগিয়ে এলে, বাচ্চাকে কিভাবে খাওয়াচ্ছ,

সব নমুনা স্বরূপ, তোমাদের কাজের সুবিধার জন্য। কিন্তু তোমরা সেই চিন্তা বাদ দিয়ে এর ভিতরই ডুবে আছ। তোমরা এই আকাশ, এই জগৎ ব্যাপকভাবে যখন চিন্তা করবে, জানবে তোমরা এই চক্রের ভিতরই আছ। এই চিন্তা থাকতো যদি ব্যাপকের সুরে তন্ময় থাকতে। দেখ, **মন হতেই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই একটা চক্রই যদি মানুষ চিন্তা করে, তবেই প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।** এই যে মাথা, এতটুকু ঘিলু, তার প্রত্যেকটি কণিকা প্রতিটি বিন্দু আলাদা আলাদা কথা বলে। তোমার মনের বুদ্ধির কাজ অনুযায়ী ওরা কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে এমন সত্তা আছে জাগ্রত, প্রকৃতির উদ্দেশ্যের সাথে তোমার সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ওরা 'হায় হায়' করছে 'আমাদের চিন্তা করছে না' বলে। আবার তুমি কাজ করলে ওরা সজাগ হয়। যখনই তুমি বিরাটের চিন্তা করবে, ওরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। ওদের যদি খাদ্য না দাও, ওরা অনাহারে প্রফুল্ল সেনের রাজত্বের মত না খেয়ে মারা যাবে।

আমরা প্রফুল্ল সেনের মত হতে যাব কেন? প্রফুল্ল সেনের দৃষ্টান্ত টেনে কেন আমরা চলতে যাব? এগুলোকে কেন আমরা মেরে ফেলবো? **সাপ যেমন শূন্য হতে, বাতাস হতে সূর্য হতে টেনে খায়, ছয় সাত মাস পর্যন্ত এইভাবে খেয়ে থাকে, তুমি পারবে না কেন?** তুমি যখন গভীরভাবে চিন্তা করবে, তোমার জিহ্বার সঙ্গে তালুর সঙ্গে যোগাযোগ হলে ওরা খাবার পাবে। তুমি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাবে, পরম পরিপূর্ণতার পথের পথিক হয়ে যাবে। তোমার দর্শন হয়ে যাবে, অনুভূতি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ বাবা, পাত্রটি কি করে হবে শূন্যে?

উত্তর ঃ তুমি নিজেই তো পাত্র। তুমি তো বাবা নিজেই জেনেছো, ঐ জায়গা হতেই এসেছে পাত্র। মাথাও গোল, আকাশও গোল। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মাত্রাজ্ঞানে যতক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পার ততক্ষণ মৃত্যুর ছকে বারবার আসা যাওয়া করতে হবে

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
সুখচর ধাম

মনে কর, এক ব্যক্তি মারা গেছে, সে যখন birth (জন্ম) নিল, X-ray যন্ত্র fit কইরা (ক'রে) দেখা গেল, সে ম্যাঁও ম্যাঁও কইরা তাড়া খাইতেছে। তুমি বাইরে থেকে তার work (কর্ম) দেখতাছ। দান-ধ্যান করতাছে, দেখতাছ। কিন্তু মৃত্যুকালে nature-এর নিক্তির ওজনে কোন্ ফলে কোন্ formation হবে, কোন্ form হবে, বলা মুস্কিল। মনে কর, এই পৃথিবীতে জন্মের যতগুলি স্তর আছে, না হলেও প্রায় ২০ কোটি রকমের স্তর আছে। পৃথিবীর মধ্যে ২০ কোটি রকমের জীবজন্তু আছে। এখন মৃত্যুর পর এই ২০ কোটি রকমের (স্তরের) কোন্টার কোন্ ছকে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বের করা যাবে না।

একজন বিরাট সাধক, জীবন ভর দান ধ্যান করছে, সকলের কাছে পূজা পাইছে। তারপর সে মারা গেল। দেখা গেল, সে birth নিয়া ম্যাঁও ম্যাঁও করতাছে। তখন অনেকে চিন্তা করলো, এতবড় বিরাট সাধক, সে ম্যাঁও ম্যাঁও করতাছে, এইটা কেমন কথা? বিড়াল হইল কি কইরা? সে তো আরও মহামানব হইয়া জন্ম নিতে পারতো। **প্রকৃতির কাছে এইখানে মহামানবের কোন দাম নাই। একটা বিড়াল হইয়া রইছে। দেখা গেল, তার সাত্ত্বিকতাটা, তার clean-work টা সে কতটুকুনু কি করেছে, সেই অনুযায়ী তার birth-টা গিয়া বিড়ালের soul-এর সঙ্গে মিশা (মিশে) গেল। এটা fall (পতন) করলো, না বড় হইল, সেইটা বুঝা মুস্কিল।** হয়তো বিড়াল হইয়া এমন কাজ করলো, সেইখানে আর একটু বড় হইল।

দেখা গেল, একটা পাখী হইয়া রইছে, বুঝতে পারছো? সুতরাং ভিতরের কাজটুকুনু প্রকৃতির ধারার সাথে, ঐ নিক্তির মাপের সাথে যদি মিল না হয়, তবে ছকে পড়তে হবে; এই গোলকধাঁধাঁর ছকে। যতগুলি জন্তু আছে, এই বিশ কোটি জন্তু আছে পৃথিবীতে, এই বিশ কোটির ছকে পড়তে হবে। কোন্ ছকে কখন যায়, কেন যায়? কোন্ মাত্রায় তুমি মারা গেলা, সেই মাত্রাটা ২০ কোটির কোন্ জন্তুর মাত্রায় গিয়া পড়বে, বলা যায় না। এখন ৬ মাত্রায় যদি মারা যাও, শকুন হইলা। ৬ মাত্রায় শকুন।

বিশ কোটি স্তরের বিশ কোটি মাত্রা আছে যেই মাত্রায় তুমি মারা যাবে, সেই মাত্রা অনুযায়ী birth নিতে হবে। এখন ৩ মাত্রায় মাছি, ৪ মাত্রায় মশা, ৬ মাত্রায় শকুন, ৭ মাত্রায় কাক, ৮ মাত্রায় কুকুর, ৯ মাত্রায় মাছ, ১০ মাত্রায় বাঘ, ১১ মাত্রায় হাতী, ১২ মাত্রায় কচ্ছপ এইরকম সব আছে। তুমি যে মাত্রায় মারা গেলা, সেই মাত্রায় যে জীব আছে, তার form নিয়া নিলা (নিয়ে নিলে)। কোন্ মাত্রায় মারা গেলা, সেটা ছাড়া Nature আর কিছু দেখবে না। দান-ধ্যান কর, পূজা কর, কিছু দেখবে না। মনে কর, ২০০ মাত্রায় তুমি মারা গেলা। দেখা গেল, সাপ হইয়া গেলা। যেই মাত্রায় মারা যাবে, সেই মাত্রার ছকে চলে যাবে। কেন, কিসের জন্য Nature কিছু দেখবে না। এই যে ২০ কোটি রকমের জীবজন্তু আছে পৃথিবীতে, এই ২০ কোটির মধ্যে মনে কর, ১০ কোটি মাত্রায় মারা গেলা, গুই সাপ (গোসাপ) হইয়া গেলা। ৫ কোটি মাত্রায় মারা গেলা, গাছ হইয়া গেলা। বিশ কোটির মধ্যে ১৯ কোটি মাত্রায় মারা গেলা, দেখা গেল, রুই মাছ, কাতলা মাছের মধ্যে একটায় পইরা গেলা (পরে গেলে) গিয়া। প্রত্যেকটি figure-এর আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি মাত্রা আছে এবং এইটাই হইল জীবের জন্মের বিশেষত্ব। এইভাবে Nature-এর জন্ম মৃত্যুর ছকে জীব বারংবার আবর্তিত হয়ে চলেছে। ১ থেকে ২০ কোটি পর্যন্ত যে মাত্রা আছে এখানে, এই ছকেই ওঠানামা করতে হবে বারবার।

২০ কোটির উর্দ্ধে যখন যাইবা (যাবে), ২০ কোটি ১-এ যখন গেলা, তখন আর birth হইল না। তখন আর তোমার উপরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষনের ক্ষমতা রইল না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা মনে কর,

১০০ মাইল পর্যন্ত। ১০০ মাইলের উর্দ্ধে গেলে আর পৃথিবীর আকর্ষণে থাকবে না। তখন পেট্রোল লাগে না। তখন নিজের গতিতে চলতে থাকবে। ১০০ মাইলের মধ্যে গেলে পেট্রোল লাগবে। প্রত্যেকটি জীবজন্তু মৃত্যুর সাথে সাথে এই ২০ কোটি ছকের মধ্যে ওঠানামা করতে থাকে। একটা শকুন যদি মারা যায় ৫০০ মাত্রায়, দেখা গেল, ৫০০ মাত্রায় আরেকটা জন্তুতে জন্ম নিল; ময়না পাখী হইয়া গেল। আবার দেখা গেল, কেউ হয়তো ১১ কোটি মাত্রায় মারা গেল, সে আবার আরেকটা প্রাণী—টিয়া পাখী হইয়া গেল গিয়া। মাত্রা ভেদে ভেদে প্রত্যেকটি জীব একেকটি জন্তুর form-এ চইলা যায় গিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত ২০ কোটি মাত্রার (স্তরের) মধ্যে প্রত্যেকে আছে, এই ২০ কোটির মধ্যেই ঘুরবে, বুঝতে পেরেছ? এই হইল লুডু খেলার ধাঁধাঁ।

যেই ২০ কোটি ১ মাত্রা স্তরে উইঠা (উঠে) গেলা, তখন এই ছকের সব মাত্রা ছাড়াইয়া ১ মাত্রায় চইলা গেলা। তখন আর birth হইল না। তখন will-এ আসলো, ইচ্ছাকৃত আসলো। তখন Nature থেকে ইচ্ছাশক্তিটা দিয়া দিল, বুঝছো? যেই ২০ কোটি ১ হইয়া গেলা, তখন ১ মাত্রা থেকে যেই formation-টা হইব, ১-এর মাত্রায় যেখানে জন্ম, সেখানে এই ছকে আর, এই ছ্যাঁচার ছক, কষ্টের ছকে আর পড়তে হবে না। তখন দেখা যাবে স্বাধীনভাবে স্বাধীন চিন্তায় স্বাধীন সুরে প্রকৃতির সুরের সাথে সুর মিলাচ্ছ। তখন তুমি তোমার নিজের কাজ বিভোরভাবে করে যাচ্ছ। সেইখান থিকা (থেকে) দেখা গেল, আরও ১০০ মাত্রায় উঠে গেলা। আরও সুন্দর হইয়া গেলা। তার মধ্যে কিন্তু তোমার জীবনীশক্তি, দেহধারণের শক্তি রয়ে গেল। যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন অবস্থায় পৃথিবীতে দেহ নিয়া দেখা কইরা চইলা যাইতে পার। তখন যে আসবা, ২০ কোটি ১ মাত্রার দেহ নিয়া আসবা। যে কোন দেহ নিয়া আসতে পার। যে কোন দেহ (form) ধারণ করার ক্ষমতা তোমার থাকবে।

পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যেও মাত্রাজ্ঞানের বোধটা অনেকসময় থেকে যায়। মনে কর, কত পাখী, কত জন্তু দেখা যায় তার thought-টা প্রকৃতির সাথে একটু মিল রাইখা (রেখে) চলতাছে।

অনেক জন্তু আছে, অনেক পাখী আছে, যারা প্রকৃতির ধারায় চলছে। তাদের ভিতরের gland-গুলি সেভাবে তৈরী। তারা নিজের থেকে, সুরের থেকেই চলছে। তবে কার মধ্যে এই সুর কতটা আছে, সেটা ধরা মুস্কিল। এখন মনে কর, ১৯ কোটি ৭ মাত্রায় মানুষের চেহারা। ১৯ কোটি ৭ মাত্রার মধ্যে সে জন্ম নিতাছে। এখানকার পরিবেশ অনুযায়ী সেইভাবেই চলতাছে। তার মধ্যে যদি মাত্রা কমে যায়, তবে ১, ২ মাত্রায় জন্ম নেবে। মাত্রা যত বেশী বাড়বে, তত ভাল। আবার যারা ২০ কোটি মাত্রাতেই মারা যাইতেছে, তারা বুড়ী ছোঁওয়ার মতন পারে গিয়া উপস্থিত হইছে। তাদের অবস্থা একটু better।

প্রশ্ন ঃ আজ্ঞে, মাত্রাটা বাড়বে কিভাবে?

ঠাকুর ঃ প্রকৃতির ধারায় যে ধারাটা চলছে, প্রকৃতির ধারার সাথে যুক্ত হয়ে যারা সেটা maintain করবে, তাদের মাত্রাটা বাড়বে। তার জন্য দিয়েছে বুঝটা (বিবেক)। প্রকৃতি কতবড় দান করে দিয়েছেন, তুমি জান? Adjustment-টা হইল নিজের বুঝ। আর কিছু নয়। এমনভাবে তোমারে capital দিয়া দিছেন, এই capital-টা হইল বুঝ। Sense, আর কিছু না। প্রকৃতির চেহারা আর খুঁইজা পাইবা না। তোমার sense এবং sense-টার সাথে আরও sense দিচ্ছেন guard দেওয়ার জন্য। তুমি তোমার ত্রুটিটাকে যদি না বুঝতে, তাহলে এই কথা বলতে পারতে না। তুমি যে ত্রুটিটা করতে যাচ্ছ, sense তোমাকে ওয়াকিবহাল করে দিচ্ছে কি না। বুঝিয়ে দিচ্ছে কি না, এইটা আগে দেখ। তুমি খুন করতে যাচ্ছ, বুঝছো কি না। আমি খুন করতে যাচ্ছি, অপরাধ করতে যাচ্ছি, এই বোধটা আসছে কি না। একটা ২ বছরের বাচ্চা পর্যন্ত বিস্কুটটা লুকাইয়া রাইখা দেয়। পরে অবশ্য ধরা পড়ে। এইখান দিয়া লুকাইলে ঐখান দিয়া আবার দেখা যায়। তুমি বুঝে যে অপরাধ করছো, এইখানে আর কোন ক্ষমা নাই।

প্রশ্ন ঃ আজ্ঞে, পরিবেশের চাপে অনেকসময় জেনেও তো অপরাধ করতে হচ্ছে।

ঠাকুর ঃ সেইটা আরও অপরাধ হইল। সেখানে আর কোন কথা নাই। তোমার বাবারে তুমি যদি শালা কইয়া বকা দাও। তুমি তো বুঝতাছ,

বাবারে শালা কইলাম। উপায় কি? উপায় হইল আফশোস। বাবারে ক্যান (কেন) শালা কইয়া ফেলাইলাম। বাবারে শালা কওয়াটা উচিত হয় নাই, এটা বুঝছো কি না। এইটাই হইল অপরাধ। **সবচেয়ে natural gift, প্রকৃতির দান হইল এই বুঝটা। প্রকৃতির দানটাই হইল তোমারে বুঝাইয়া দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্ত্তে কেউ তোমারটা বুঝুক বা না বুঝুক, তুমি তোমারটা বুঝবা। সুতরাং পথ পরিষ্কার করার পথ তোমার আছে।** এখন যে যতটা বেছে চলতে পারে।

পায়ের তলায় ফুটে একটা কুলের বীচিতে হাতী মারা গেল। এইজন্য হাতী শুঁড় দিয়ে ফুঁচ ফুঁচ করতে করতে রাস্তায় চলে। হাতী যদি ফুঁচ ফুঁচ কইরা না যায়, হাতীর পায়ের তলা এত নরম, এত soft, একটা ছোট কুলের বীচি হাতীর পায়ের নীচে ঢুকে হাতী চিত হয়ে গেল। সুতরাং সে তার বুঝ বুইঝা চলছে। সে অত্যন্ত conscious. সে চোখ দিয়া দেখে আর ফুঁচ ফুঁচ কইরা ঐ বাতাসে রাস্তাটারে পরিষ্কার কইরা দেয়। এইভাবে সে হাঁটে। হাতী সেও সজাগ। সে যদি জলকাদা দেখে, হাতী কিছুতেই নড়তে চাইবে না। তার বুঝটা কি রকম পাকা। সে বোঝে ঐ পাঁকে যদি পাটা ডুবে যায়, 'আমি আর উঠতে পারুম না।' তখন হাতী বেঁকা হইয়া থাকে। তার অনিচ্ছা জানিয়ে দেয়।

তোমার জীবনে এরকম কুলের বীচি অনেক আছে। সতর্ক হইয়া ফুঁচ ফুঁচ কইরা না যদি যাও, ফস্‌কে গেলে ঢুকে শেষ। Nature তোমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে guard দিয়া, protection দিয়া ছেড়ে দিচ্ছেন will কইরা (করে)। এটাকে বলে will. এই will-এর যদি তুমি ব্যতিক্রম কর, সেখানে আর কোন কথাবার্তায় চলবে না। কোন বুঝে চলবে না। 'আমি কি করুম, উপায় নাই', সেইটা চলবে না।

প্রশ্ন ঃ বাবা, তোমার কাছে যদি বলি?

ঠাকুর ঃ আমারে আবার টানো কিয়ের লইগ্যা (কিসের জন্য) এর মধ্যে?

প্রশ্ন ঃ বাবা, তুমিই তো আমাদের সব। এই যে অগণিত পোকা

মারছি, অপরাধতো হয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর ঃ আর কোন কথা নাই। এইগুলি আমারে বইলা (বলে) কোন লাভ নাই। তোমার অপরাধের বোঝা তোমাকে বইতে হবে। কেউ বহন করবে না। রত্নাকর দস্যু ডাকাতি করতো। জানোস্ তো গল্পটা। ডাকাতি কইরা কইরা বাপেরে মায়েরে খাওয়াইতো। তখন এক সন্ন্যাসী বললেন, ''হে রত্নাকর, তুমি এই যে ডাকাতি কইরা চলছো, খুন-খারাপি করছো, তোমার এই অপরাধের ভার কে নেবে?''

রত্নাকর বলে, কেন? আমি বাবা মায়েরে খাওয়াই।

সন্ন্যাসী ঃ বাবা মা'কি নেবেন অপরাধের ভার? রত্নাকর বলে, নিশ্চয়ই নেবে।

সন্ন্যাসী ঃ তুমি বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করে এস। আমি দাঁড়াইলাম। যদি বাবা মা নেন, তাহলে তো কোন কথাই নাই।

'ও' (রত্নাকর) গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে বলে, 'বাবা, আমি এই যে ডাকাতি করতাছি, খুন খারাপি করতাছি, এই অপরাধের ভার তুমি নেও না?'

বাবা বলেন, ''আমার কর্ত্তব্য সন্তানকে লালন পালন করা। আমি তাই করেছি। সন্তানের কর্ত্তব্য বাবা মাকে দেখা। তুমি কিভাবে রোজগার করে আমাকে খাওয়াচ্ছ, আমি কেন সেই দায়-দায়িত্ব নেব?''

শুনে তো রত্নাকরের মাথায় হাত। সাধুকে প্রণাম কইরা (করে) বলে, ''না, বাবাতো নিল না।''

— কেউ নেবে না, কেউ নেবে না।

তোমাদের এক একজনের পাহাড় তুল্য অপরাধ জমে গেছে। ধাপার মাঠ হয়ে গেছে। তবে আফশোসে কিছুটা কমে। সামান্য সামান্য ত্রুটিগুলো আফশোসে হালকা হয়ে যায়। বইয়া বইয়া (বসে বসে) আফশোস কর, অনেকটা কমবে।

উপায় নাই। আমি জন্মের থেকে এই লাইনে আছি। কথাটা বুইঝো। আমি এইটাই বুইঝা নিছি, মাধ্যাকর্ষণের মতো এই যে জন্মের আকর্ষণ আছে, ২০ কোটি স্তর আছে, এর উর্দ্ধে না যাওয়া অবধি— এই যে ছক, এই যে গোলোকধাঁধাঁ, সাপলুডোর খেলা চলতে থাকবে। একবার মই বাইয়া (বেয়ে) ওপরে ওঠো। ৯৮ পর্যন্ত উঠছে, ৯৯-তে আছে সাপের মুখ। তারপর ৯৮ থেকে ১ পইরা ৯৯-এ সেই সাপের মুখে পড়লো। তারপর এক্কেবারে ২-এ আইয়া পড়ছে। ইস্-সিরে। মাথায় হাত দিয়া বইয়া (বসে) পড়ছে। ল্যাজটা তাহলে কতবড় বোঝ। কোথায় ৯৯; আর কোথায় ২-এ আইয়া নামছে। মাথা আর কপাল থাপরাইতাছে। এইরকম ছকে আইসা পড়বে।

প্রশ্ন ঃ ঠাকুর, তোমার নাম বললে কমবে না?

ঠাকুর ঃ এত সংক্ষেপে করতে যাইয়ো না এখন। ছকে যা আছে, তা জানাইলাম।

প্রশ্ন ঃ তাইলে ঠাকুর, কেউ তো এই ছক থেকে উঠতে পারবে না।

ঠাকুর ঃ সবই compulsory করতে হয়, অসুবিধায় করতে হয়, সবই আমি স্বীকার করি। কিন্তু মাত্রায় স্বীকার করবে না, মাত্রায় স্বীকার করবে না।

বাবায় কইছিলেন আমারে, কচ্ছপটা ধর। না হয় কুড়ালটা ধর। কচ্ছপ কাটবে। আমারে কইছিলেন, 'কুড়ালটা ধর। আমি ঠাস ঠাস কইরা মারি'।

আমি বললাম, বাবা নমস্কার। আমি এই কচ্ছপের কুড়াল ধরতে পারবো না। আপনে আমার ঘাড়ে দুই চারটা দিয়া দেন, আমি রাজী আছি।

বাবা বলেন, তুই আমার কথা শুনবি না?

— বাবা আপনার কথা আমি সব সময় শুনবো। এইটা আমার কাছে ভীষণ অপরাধ লাগছে।

বাবা গিয়া পরে আশু সেনকে বলছেন, 'শুনছেন আমার পোলার (ছেলের) কাণ্ড।'

আশু সেন বলেন, ''আপনার পোলা তো তা করবেই। আপনি কুড়াল নিয়া গেছেন কচ্ছপ কাটতে। আপনার পোলায় তা ধরবে? এই পোলা কুড়াল ধরার পোলা না।''

বাবা নিজেও আর কচ্ছপ কাটতে পারলেন না আমার এই কথার উপরে। কচ্ছপটারে ছাইড়া (ছেড়ে) দিয়া আইলেন। অনুকূল আছিল বাড়ির পিয়ন। অনুকূলরে কইলেন, ''অনুকূল, তুই ছাইড়া দিস্। আমি যাই গিয়া।'' বাবায় কচ্ছপ কাটতে পারলেন না।

তখন আমার বাচ্চা বয়স। ৬/৭ বছর বয়স। গোঁসাই বইলা ডাকতো সবাই। পৌণে দুই টাকা প্রণামী পাইছি। তখন পৌণে দুই টাকা মানে এখন প্রায় ১০০ টাকার সামিল। দুই টাকা/আড়াই টাকা মণ চাউল। বাজারে গিয়া ৮/১০টা কচ্ছপ কিনছি। সব দড়ি দিয়া বাইন্ধা (বেঁধে) চিৎ কইরা ফেলাইয়া থুইছে (চিৎ করে ফেলে রেখেছে)। সবগুলি কচ্ছপ কিনছি। হাইরা আছিল। 'হাইরা' নাম শুনছোস্ না। হাইরা, এদিকে আয়।

— গোঁসাই।

— দড়িগুলি কাট। সব গুলি দড়ি কাটালাম। জলে ছাইড়া দিয়া আয়।

হাইরা ৮/১০ টা কচ্ছপ লইয়া জলের পাড়ে উপস্থিত। কাছেই জলের পাড় আছিল।

— এবার ছাড় একটা একটা কইরা।

একটা একটা কইরা সব কয়টা কচ্ছপরে জলে ছাড়লো হাইরা।

ইস্ ক্যাতাইয়া ক্যাতাইয়া সবগুলি গেল গিয়া। খুশী। কি খুশী।

আমি বলি হাইরাকে, ঐ ব্যাটা। আমার ৬/৭ বছর বয়স, ভুলে যেও না। হাইরা কিন্তু ডাকাতের সর্দার। কি রে ব্যাটা। খাইয়া আনন্দ পাইতি?

না ছাইড়া আনন্দ পাইতাছোস্ (পাচ্ছিস্)?

— এ্যাঁ গোঁসাই।

একটা কচ্ছপ আবার ফিরা ফিরা আমার দিকে তাকায়। আমি বলি, দৌড়া দৌড়া। তাকাইস্ (তাকাস) না আর। এইভাবে ৮/১০ টা কচ্ছপ ছাইড়া দিলাম।

একবার বাজারে ৩০/৪০টা পায়রা বিক্রী করতে আইছে। ভাল ভাল পায়রা সব। আমি গেছি পায়রা কিনতে।

এই পায়রাগুলির দাম কত?

— ৫ টাকা

— টাকাতো আমার হাতে নাই। ১টা টাকা আছে।

— হাইরা।

— গোঁসাই।

তুই আমারে ৪টা টাকা দেতো। ১৫/২০ দিন পরে পাবি। যাঃ।

হাইরা টাকা দিল। ৫ টাকা দিয়া পায়রাগুলি কিনলাম। খাঁচা থিকা খোল ব্যাটা। উড়াইয়া দে। পায়রাগুলি উড়ে গিয়ে কী দৌড় দিছে না সব। পাইছে মুক্ত আকাশ। গেছে গিয়া।

এক শিষ্য বাড়ীতে গেছি। ৮/১০টা খাঁচায় ময়না পাখী, টিয়া পাখী, নানান পাখীতে ভর্ত্তি। আমি খুব সকাল বেলা উঠছি। সবাই ঘুমাইতেছে। আমি সব খাঁচা খুইলা খুইলা দিছি। সবগুলি গেছে গিয়া। আমি গিয়া আবার শুইয়া পড়ছি। ওরা ঘুম থিকা উইঠা (উঠে) ছোলা টোলা লইয়া গেছে; পাখী নাই। এই পাখীগুলি গেল কোথায়? আমি আর কিছু কই না। কোথায় গেল? কোথায় গেল? সারা বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। আর আমি কিছু কই না। সব ছাইড়া দিছি। শিষ্য বাড়ীতে গিয়া সব সুন্দর সুন্দর পাখী, আমি ছাইড়া দিছি।

একজনরে মারতে গেছে। আমি বলি, মাইরো (মেরো) না। যারে বকতে যায়, আমি বলি, বইকো (বোকো) না। ওরা কেউ দোষ করে নাই।

— গোঁসাই কে ছাড়লো?

— ছাড়বো কেডা? আমি দেখছি। যে ছাড়ছে, আমি দেখছি। আমি কিছু বলি নাই। ঠিক আছে। মুক্ত আকাশের মুক্ত পাখী। খাঁচায় রাখা যে কত দুঃখ, এরচেয়ে দুঃখ আর কিছু নাই। যে ছাড়ছে, সে ভালই করছে। তুই এত ভাবিস্ না। আমি এটা সমর্থন করছি। ইচ্ছা করলে আমি আটকাইতে পারতাম। সবই সত্য কথা কইতাছি। কিন্তু আটকাই নাই। তুই ছাইড়া দে। শেষে হাতজোড় করছে। বুঝছে, গোঁসাই এই কাম করছে। সবাই বুঝছে। সব খাঁচা ফেলাইয়া দিছে।

বাথরুমে গেছি। জলের দেশ তো। দেখি, এতবড় একটা ওল্লা পড়ছে। কাঠি দিয়া পায়খানার মধ্য থিকা ওল্লাটারে উঠাইয়া বাঁচাইয়া আইসা পড়ছি।

বাজারে গিয়া ছোট ছোট মাছ কিনছি। বজরী ট্যাংরা বলে আমাদের দেশে। দুই পয়সায় অনেকগুলি দিছে। সব নড়তাছে। মাছগুলি সব জলে ছাইড়া দিয়া খালি ডুলাটা লইয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত।

মা কয়, মাছ আনলি না?

— আনুম কি? মাছের মধ্যে আমি দেখি কি, অনেক লোক। বুঝছো? তখন conscious ছিলাম। X-ray যন্ত্র fit কইরা দেখতাম। এখন বন্ধ কইরা দিছি। আমি দেখি কি, ৫০/৬০ জন লোক লইয়া যাইতেছি, ঐ ডুলার মধ্যে।

মা, ঐগুলি কি খাওন যাইব?

— মা কয়, কি করছোস্?

— সবগুলি জলে ছাইড়া দিছি।

— ভাল করছোস্। ভাল করছোস্। ৫০/৬০ জন লোক আছিল?

— হ্যাঁ ৫০/৬০ জন লোক দেখছি আমি X-ray যন্ত্র দিয়া। আর

তোমরা এই মাছ যে খাও, হয়তো, ২ বছর আগে একটা লোক মারা গেছে, তার soul-টা এই form-এ আইছে। ভাল লাগবে খাইতে?

বাজারে আমি লোক পাঠাইছি। তখন আমার ৯ বছর বয়স। হাইরা আছিল, নবদ্বীপ আছিল, বাবার নামে নাম সুরেন্দ্র আছিল, মহীলাল আছিল। প্রায় ৩০/৪০ জন ঘরের মধ্যে বসেছিল। সব একত্র হইয়া বসতো। হাইরা আর মহীলালকে বললাম, ১৫ মিনিটের মধ্যে বাজার কইরা আনবি। দুইজনের মাথায় দুইখান থাপ্পর দিয়া দিলাম। বাজার করতে পাঠাইছি ২ টাকা দিয়া। এমন লোকের থিকা জিনিস আনবি না যে মানুষ না। যে মানুষ না, তার থিকা কিছু আনবি না।

বাজারে ঢুকছে। বিরাট বাজার। বাজারে গিয়া প্রথম থিকা শেষ পর্যন্ত একটাও মানুষ দেখলো না। ভয় পাইয়া গেছে। কেমুন করতাছে। উরে বাপরে, উরে বাপরে। কেউ ফোঁস কইরা উঠছে ভিতরে। কেউ হাউ কইরা উঠছে। যার কাছে যায়, ভয় পাইয়া আসছে। অন্যেরা বলে পাগল হইয়া গেল নাকি?

শেষে চিৎকার কইরা আইয়া (এসে) লম্বা হইয়া পায়ে পড়ছে, বাবা কোথায় পাঠাইছিলা?

আমি বলি, কি হইল তগো (তোদের)? হইলটা কি?

— বাবা, মানুষ পাই নাই। মানুষ পাই নাই।

— মানুষ পাস নাই?

— সব সাপ, ব্যাঙ্, কচ্ছপ একটাও মানুষ নাই।

বাজার থিকা সব পয়সা ফেরত লইয়া আইসা আমার হাতে আইনা দিছে।

ছোট বয়সে আমার কাছে কেন সব দীক্ষা নিল? এমনি এমনি? মাষ্টার কখনও ছাত্রের কাছে দীক্ষা নেয়? আনন্দ মাষ্টার আমাদের পাঠশালায় পড়াইত অ আ ই ঈ। মাষ্টারমশাইরে কইলাম, মাষ্টারমশাই, আপনার মাথায় একটা থাপ্পর দিই?

— দাও।

— থাপ্পর দিছি। ঘরের মধ্যে প্রায় ৪৫ জন ছাত্র। মাষ্টারমশায় হাঁটু পর্যন্ত কাপড়টা উঠাইয়া লাফাইতে শুরু করছে। একটাও মানুষ দেখে না।

ছাত্ররা আমারে জিগায় (জিজ্ঞাসা করে), তুমি কি কইরা দিছ?

মাষ্টারমশায় একটাও মানুষ দেখে না। ভয় পাইতাছে। কেউ ফোঁস কইরা ওঠে। মাষ্টারমশায় বাইরে গিয়া দাঁড়াইয়া রইছে। সব মাছি, মশা ভর্ত্তি। মানুষ একটাই দেখছিল। তারপরেই তো মাষ্টারমশায় ফুল বেলপাতা লইয়া উপস্থিত দীক্ষা নেবে। আমারে বলে, বাবা, ''তুমি কি দেখাইলা? একটাও তো ছাত্র দেখলাম না। সব সাপ, ব্যাঙ দেখলাম।'' মাষ্টারমশাই দীক্ষা নিল। আমি বলি, ''বুঝছেন তো, আমরা কোথায় আছি? এই গ্রামটা ঘুইরা (ঘুরে) একটাও নিজের নিজের soul-টা দেখবেন না। সব অন্যের soul-ই বেশী দেখবেন।''

আমি মাথায় থাপ্পর দেবার পরে, অন্যেরা যেই figure-এ আছে, যদি সেই figure-ই দেখে, তাইলে মাত্রা বুঝা গেল, উঁচুর দিকে আছে। আমি ওরে (ওকে) মাথায় একটা থাপ্পর দেবার পরে যদি দেখে, তার এই figure-টা ঠিক আছে, তাইলে অনেকটা better. একটা মাছির বেলাও ঠিক তাই। মাছি যে figure-এ রইছে, সেই মাছির figure-টা যদি সেই figure-এ থাকে, তাহলে better। একটা পিঁপড়া দেখলা, সেই পিঁপড়াটা একটা হাতী আছিল। পিঁপড়া এতটুকু, দেখলা হাতী আছিল। এত বড় বড় ৪টা ইলিশ লইয়া আইল। বাঃ কি সুন্দর গঙ্গার ইলিশ। দেখা গেল, অনেকসময় চেনাশোনা বাইরাইয়া গেছে গিয়া। তোমাদের জানাশোনার মধ্যে কেউ হয়তো মারা গেছে। সেও দেখা গেল, এই মাছের figure-টা লইয়া আইয়া পড়ছে। তুমি তখন বেশ কইরা ইলিশ মাছ ভাজা, ইলিশ মাছের ঝোল খাইতাছ। কথাটা বুঝতে পারছো? জানাশোনা figure এরকম দেখা গেছে। মা তারপরে মাছ খাওয়া ছেড়েই দিল। বাবা জীবিত থাকাকালীনই মা মাছ ছেড়ে দিয়েছে, এর পরের থেকে। নিজে নিরামিষ খায়।

X-ray যন্ত্র দিয়ে দেখলে কোন জিনিস গ্রহণ করা যাবে না, এমন

অবস্থা। প্রকৃতি এই বুঝটাকে চাপা দিয়ে দিয়েছে। একটাই বুঝ দিয়েছে, প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টি নয়। আর কারণ ছাড়া এগুলো হয় না। কোন figure কারণ ছাড়া নয়। ২০ কোটি figure আছে মনে কর। এই ২০ কোটি figure কেন হইল? কারণ ছাড়া হয়নি। **এক একটা মাত্রার এতটুকুনু change-এ এক একটা দেহ হয়ে যাচ্ছে। সেই মাত্রাও আবার change হয়ে যায়। Body-তে থেকেও মাত্রা change হয়ে যায়। ছেলে মেয়ে হয়ে যায়।**

এক ব্যক্তি খুব একেবারে সাধনা টাধনা কইরা বাঘের লগে মিশা, সবার লগে মিশা gland গুলো সব আয়ত্তে আনলো। মানুষ অবস্থায় gland গুলো সব আয়ত্তে আনা যায়। তোমার মাত্রায় ঘ্রাণ হইল ৮/১০ হাতের মধ্যে। তোমার ঘ্রাণশক্তির সীমানা ঐ পর্যন্ত। কিন্তু একটা মাছির ঘ্রাণশক্তি ৫ মাইল পর্যন্ত। একটা কাঁঠাল ভাঙ। নীচের থেকে তুমি গন্ধ পাইবা না। একটা ফজলী আম কাট। কোথেকে ছ্যাট কইরা একটা মাছি আইসা হাজির হবে। দেখা গেল সে ৩ মাইল দূরের থিকা আইছে। তোমারও ঘ্রাণশক্তি আছে। একটু সীমাবদ্ধে আছে। আর মাছির ঘ্রাণশক্তির capacity ৫ মাইল/৭ মাইল পর্যন্ত। ছোট্ট ওইটুকু দেখলে কি হবে, capacity কত বড়।

এক ব্যক্তি চিন্তা করলে সে বাঘ হতে পারে। চিন্তা করলে মোষ হতে পারে। এই gland-টা সে আয়ত্ত করে ফেললো। বুঝছো কথাটা? বাড়ীতে এসেছে প্রায় ২০ বছর পরে। সব পাড়ার ছেলেরা, ওর নিজের ছেলেরা অরে (ঐ ব্যক্তিকে) ধরছে, ''বাবা, তুমি বাঘ হইতে পার। আমাগো বাঘ দেখাও।'' পাড়ার সব ছেলেরা এসে বলছে, ''মেসোমশাই, আপনি বাঘ হইতে পারেন, আমাদের দেখান।''

তিনি বলছেন, ''দেখাবো তো। তোরা তো ভয় পেয়ে যাবি। তখন আমার কি হইব?''

তারা বলে, ''না, না। ভয় পাবো কেন? আমি জানি আমার বাবা। আমরা জানি, আমাদের মেসোমশায়।''

— তাহলে এক কাজ কর। আমার **power**-টা আমি এক গ্লাস জলের মধ্যে দিয়া দিলাম। ১ গ্লাস জল রাইখা দিছে (রেখে দিয়েছে)।

— যখনই বাঘ হইয়া যামু, তখন দেইখা দেইখা জলের ছিটাটা দিস। তাইলেই আবার মানুষ হইয়া যাব।

পাড়ার সমস্ত লোক, আত্মীয় স্বজন মিলা প্রায় ৫০০/৭০০ লোক হইছে। সব বসছে। ঐ ব্যক্তি একটা আসনে বইসা আস্তে আস্তে কইরা বাঘের গ্ল্যান্ডটা যে ওর মধ্যে আছে, তারে জাগাইতেছে। প্রত্যেকের মধ্যে ২০ কোটি গ্ল্যান্ড আছে। ২০ কোটি গ্ল্যান্ড; ২০ কোটি জন্তু। আস্তে আস্তে কইরা নখ বড় হইতাছে, থাবা টাবা বাইরাইতাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ Royal Bengal Tiger. সব ভয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করছে। একটা Period আছে তো। সব ভয়ে দিছে দৌড়। গ্লাসের জলটা উল্টে গেছে। গ্লাসের জলটা পড়ে গেল।

'ও' (ঐ ব্যক্তি) দেখলো জলটা পড়ে গেছে। তার মাঝে বাঘের হিংস্র বৃত্তিটা এসে পড়ছে। বুঝটা আছে। কিন্তু হিংস্রতা তাকে আয়ত্ত করে ফেলছে। সে বুঝলো, 'আমার আর এখানে থাকা উচিত না।' আস্তে আস্তে কইরা তাকাইতে তাকাইতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বনে চলে গেল। আর মানুষ হতে পারলো না।

কারও মাত্রা মনে কর, ২০ কোটি ৫ হইয়া গেছে। তার আর birth হবে না।

God উপাধিটা মানে Stage of God. ওরে বাবা, মাত্রা অনুযায়ী birth হয়। এছাড়া আর কোন কথা নাই। একজন এখানে সাধনা কইরা কতবড় হইয়া গেল। সে দানে ধ্যানে কর্মে জীবনভর মহান্ আখ্যা পাইল। নিয়ম নিষ্ঠায় হবিষ্যি করতো, নিরামিষ খাইত। কিন্তু তার যখন death হইয়া গেল, ম্যাঁও ম্যাঁও করতাছে। বিড়াল হইয়া গেছে। তখন তার ভক্তরাও বুঝতে পারলো যে, সে বিড়াল হইছে। তারা টের পেয়ে গেল। তারা নালিশ করলো প্রকৃতির দরবারে, 'কেন সে বিড়াল হইল?'

মাত্রাজ্ঞানটা হয় কি করে? মাত্রা ওঠে ভিতরে। Taxi-র মিটার

ওঠে ভিতরে। গাড়ীটা বড়। মাত্রা উঠতাছে। মাত্রা উঠবে ভিতরে। যত কর্মই করুক, দানধ্যান করুক; মাত্রা যদি না ওঠে, কিছুতেই সে জয় করতে পারবে না। তার মাত্রাটা হয়ে গেছে। বিড়াল হয়ে গেল। বিড়াল হয়ে গেলেই যে মানুষের চেয়ে অধম হয়ে গেল, তা কিন্তু নয়। যে কোন মাত্রা হইতে পারে। মাত্রাটা যে কোন মাত্রায় ওঠানামা করতে পারে। যে পর্যন্ত সব মাত্রাগুলির উপরে না ওঠা যাবে, উপরে না উঠা অবধি, মাত্রার ছকে এই গোলোক ধাঁধাঁয় তোমাকে ঘুরতেই হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নাই। কে শ্রেষ্ঠ, কে অধম বলা সম্ভব নয়। কোন্ মাত্রায় কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট, বলা মুস্কিল। প্রকৃতির দরবারে সবার সমান অধিকার। প্রত্যেকটি মাত্রার এক পর্যায়। কার পর্যায়ে কি, কিছু বলা যায় না। যথক্ষণ পর্যন্ত তুমি মাত্রা জয় করতে না পার, তুমি এই ২০ কোটি স্তরে ওঠানামা করতে থাকবে। যেই বিশ কোটি ১ মাত্রায় চলে গেলা, ব্যাস্। তখন বুঝা গেল সব। মাধ্যাকর্ষণের কবলে যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবা, যত ঊর্দ্ধেই ওঠ, ধুপ করে পড়ে যাবে। তার আকর্ষণের ঊর্দ্ধে যেই উঠে গেলে, তখন আর কারও কোন কিছু থাকবে না। শুধু প্রকৃতির আপন সুরে, আপন ধারায় চলতে থাকবে।

এই জীবনভর কি কাজ করলা, তীর্থ করলা না দানধ্যান করলা, এইগুলিতে মাত্রার কোন বেশীকম হয় না। মাত্রা উঠবে প্রকৃতির ধারাপাতার ধারায়। যেইভাবে প্রকৃতির সুর গাঁথা আছে, সেই সুরের সাথে যে হাত মিলিয়ে চলতে পারবে, সে-ই সব জয় করতে পারবে। একজন এদিকে ধ্যান জপ করতাছে, ঐ দিকে Sex-এর রোগে, কামের রোগে ভুগতাছে। কথাটা বুইঝো। সে উঠতে আর পারতাছে না। ঐটাই তাকে জ্বালাতন করছে। আর এটাকে বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কইরা চলছে। সংযম করতাছে। কিন্তু দমন আর হইতাছে না। সেও বিব্রত হইতাছে। মাত্রায় আর উঠতে পারতাছে না।

মাত্রায় উঠতে গেলে স্বচ্ছতায় ভরপুর হতে হবে। প্রকৃতির ধারাপাতার ধারায় ভরপুর হতে হবে। কোন সংস্কারে থেকেও সংস্কারমুক্ত হতে হবে। সর্ব অবস্থায় কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ নিক্তির ওজনে

তোমাকে বলে দেবে। প্রকৃতির সবচেয়ে বড় দান হ'ল বুঝ। প্রকৃতির কতবড় কৃপা বল, দয়া বল, বুঝটা তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন। যতটুকুনু বুঝ আছে, প্রত্যেকের জীবনকে সুপথে চালিত করার জন্য এটাই হ'ল স্টিয়ারিং প্রত্যেকের হাতে। একটা পিঁপড়ার হাতেও তার স্টিয়ারিংটা আছে। তাই নিজেকে বাঁচাবার মতন অধিকার রাখে যারা, তাদের হাতেই স্টিয়ারিং। একটা বাঘ বল, শিয়াল বল, কুকুর বল প্রত্যেকেই তার জীবনকে রক্ষা করার জন্য স্টিয়ারিং ঘুরাচ্ছে। তারপরে accident হতে পারে, সেটা আলাদা কথা। স্টিয়ারিং ধরার মতন ক্ষমতা, প্রতিটি জীবজন্তুর প্রত্যেকের আছে। **তোমার জীবনকে রক্ষা করার জন্য তোমার হাতে স্টিয়ারিং আছে। তুমি যদি কোন গোপন কাজ করো, তোমার স্টিয়ারিং আছে। কারণ গোপন কাজ যে করছো, তুমি তো বুঝতাছ। যদি না বুঝতে গোপন কাজটা, তাইলে কোনকিছু বলার ছিল না। প্রকৃতির এই মহাদান জীবনকে রক্ষা করার জন্য, পবিত্রতাকে রক্ষা করার জন্য এবং যার যার মাত্রাকে বাড়াবার জন্য আর শেষ মাত্রায় পৌঁছাবার জন্য সেই স্টিয়ারিং তোমাকে দিয়েছে।** তুমি অন্যায় করতাছ। ভাল-মন্দ কাজ করতাছ। কিন্তু অন্যের কাছে ঢাক পিটাইয়া চলছো, 'আমি সাধু আমি গুরু।' ঐ সমস্ত এখানে চলবে না। তুমি তোমাকে ফাঁকি দিচ্ছ কি না আগে দেখ। তুমি তোমার স্টিয়ারিং ছাড়াইয়া চলছো কি না, এই বুঝ তোমার আছে কি না, আগে বোঝ। এই বুঝ প্রত্যেকের আছে।

জীবজন্তু ২০ কোটি যদি থাকে পৃথিবীতে, এই বুঝ প্রত্যেকের আছে। এই বুঝ ছাড়িয়ে তুমি যদি চলো, বুঝকে দাবিয়ে রেখে যদি তুমি চলো, বুঝকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রেখে যদি তুমি চলো, আরেক গুঁতা দিয়া যদি চলো, তুমি তো বুঝতাছ, তুমি ত্রুটি করতাছ। তাহলে মাত্রা তুমি কি করে উঠাবে? মাত্রা যদি উঠাতে চাও, তোমার নিজস্ব চিন্তাধারায় স্টিয়ারিংটাকে বুঝটাকে এমন পাকা রাখতে হবে যে, অন্য পথে যেতে বললেও তুমি যাবে না। না গেলে এমন অবস্থা, তখন তোমার অনেক যুক্তি আছে। তাহলে আমি চলুম কেমনে? তাহলে তো মার খেতে হইব; তাইলে তো আমার অসুবিধা হবে; তাইলেতো আমার ঠকতে হবে, ইত্যাদি অনেক কিছু কারণ তোমাদের আছে। কিন্তু মাত্রা তো কোন কারণ দেখবে না। তালে ভুল

হলে ভুল ভুলই। তোমার তাল যদি ভুল হয়, সেই তাল ভুলই। ভুলই রয়ে গেল। সেটা গোঁজামিল দিয়া বলার চেষ্টা করবে না, 'আমার পেট ব্যথা হইছিল, আমি তালটা দিতে পারি নাই।'

হ্যাঁ, কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কারণটাতো মাত্রায় শুনবে না। প্রকৃতির মাত্রায় সেটা শুনবে না। দেখ না ঝড় হোক, বন্যা হোক উদারচিত্তে সে দিচ্ছে। আবার ধ্বংসও উদারচিত্তে করছে। দুইটাই সমান। সমানভাবে চলছে সব। তার মধ্য দিয়া তোমার চলতে হবে। প্রকৃতির ধারাপাতায় যে সত্য আছে, যে স্বরগ্রাম আছে, যে নীতি আছে সেই নীতি, সেই ধারায় তোমার চলতে হবে। তার বাইরে চলতে গেলে ঠকতে হবে। কাজ উদ্ধার করে তুমি আসতে পার। কিন্তু ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

আমার এক শিষ্যের মেয়ে একটা পোলারে ভালবাসছে। তার বাবা মা নালিশ করছে আমার কাছে। মেয়েটার কোন্ এক ছেলের সাথে ভালবাসা হইছে। কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নাই। আর উপায় নাই, সে কইতাছে আমার কাছে। বাবা, তুমি বাঁচাও।

— আইচ্ছা, বাঁচাইতেছি দাঁড়া। মেয়েটারে করছি কি মাথায় দুইটা থাপ্পর দিয়া দিছি। তারপরে ছেলেটা ঘরে আইতে (আসতে) চাইলেই দরজা বন্ধ কইরা দিছে। দেখছে, একটা গুইসাপ। গোসাপ আছে না? দেখছে, ঘরের মধ্যে গুইসাপ ঢুকতাছে। যেই গুইসাপ দেখছে, দিছে দৌড়। মেয়েটা চিৎকার করতাছে, 'ও মাগো, মাগো। বাবা, বাবা। ঘরে বড় গুইসাপ ঢুকতাছে।'

ছেলেটি বলে, 'আমি ঢুকছি। গুইসাপ না; গুইসাপ কোথায়?'

উরে বাপরে বাপরে বইলা বাইরাইয়া গেছে গিয়া। বাইরাইয়া গিয়া কয়, 'মা, গুইসাপ।' ছেলেটা লগে লগে যাইতেছে মেয়েটারে ধরতে, 'তোমার কি হইছে?' আর মেয়েটা গুইসাপ, গুইসাপ কইরা চিৎকার করতাছে। সারা বাড়ীময় দৌড়াদৌড়ি শুরু কইরা দিছে। তারপর আমার কাছে লইয়া আইছে, 'বাবা, মেয়েতো পাগল হইয়া গেছে।'

আমি বলি কি হইছে?

মেয়েটি বলে, 'আমারে গুইসাপে তাড়া করছে।'

— হ্যাঁ। যার লগে প্রেম করো, সে গুইসাপ আছিল। এখন চিন্তা কইরা দেখ, গুইসাপের চেহারা। এই যে প্রেম ছুইটা গেল, অরে (ছেলেটারে) দেখলেই গুইসাপ দেখে। কিসের প্রেম? প্রেম-ট্রেম সব ছুইটা গেছে না? আর প্রেম নাই।

৫/৭ বছর বয়সে হাজার হাজার দীক্ষা নিয়েছে কি এমনি? চারিদিকে হৈ হল্লা লাইগা (লেগে) গেছিল সব— মাষ্টারমশায়দের মধ্যে, সাধারণ মানুষদের মধ্যে। কেউ আর পড়াইতে পারে না ঘরের মধ্যে। ইস্কুল কি ইস্কুল দেখে সব সাপ, ব্যাঙ, মশা, মাছি। সব দৌড়াদৌড়ি করতাছে। কোন মাষ্টার আর চেয়ারে বসে না। সব দৌড়াদৌড়ি লাইগা গেছে। কতদিন গেছে এরকম।

তাই তোমাদের কাছে কথা হল, মাত্রা যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়াতে না পার, মাত্রাজ্ঞানে যতক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পার, মাত্রার সুরে যতক্ষণ পর্যন্ত যাইতে না পার, এই ছকে ঘুরে এই প্যারাশনি পোহাইতেই হবে। পৃথিবীতে কমের পক্ষে প্রায় ২০ কোটি জন্তু আছে, ২০ কোটি চেহারা আছে। এই ২০ কোটি মাত্রায় সবাইকেই ঘুরতে হইতাছে। এই ২০ কোটির উর্দ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত যাইতে না পার, জন্ম-মৃত্যুর ছকে বারবার আসা যাওয়া করতে হবে। একটা লোকও যা দেখতাছ, একজীবনে লোক হইয়া আসে না। তার আগের জীবনটা দেখলেই দেখবা হয় মশা, না হয় মাছি, না হয় পাখী, না হয় শকুন, না হয় মাছ, এইসবই বেশী। মশা, মাছিই বেশী। কাক বেশী। এখানে কাকে ভালবাসবে তুমি? কার লগে প্রেম করতে যাইবা? কার লগে কথাবার্ত্তা কইতে যাইবা? কিছু ভাল লাগবে না।

প্রশ্ন ঃ ঠাকুর, ২০ কোটি মাত্রার উর্দ্ধে উঠতে গেলে কি করতে হবে?

ঠাকুর ঃ তুমি পবিত্রতা অবলম্বন কর। ঐ প্রকৃতির ধারাপাতা অনুসরণ করে যে চলবে, সে-ই একমাত্র বেঁচে যাবে এবং এই বেঁচে যাওয়ার মতন বুঝ, বুদ্ধি, বিবেচনা প্রকৃতির দান হিসাবে সবটা তোমাদের মধ্যে

দিয়ে দিয়েছে। এরমধ্যে আর অন্য কোন কৈফিয়ৎ যুক্তি, তর্ক দিয়ে তোমরা বুঝাইতে পারবা না। যত কারণই থাক, যত যুক্তিই থাক, যত যা কিছু থাক সবটাই, মাত্রা ছাড়িয়ে, বুঝ হারিয়ে অবুঝ হয়ে যাওয়ার মতন কিছু নাই। আবার **মাত্রার ছকেই সব গড়া। তুমি কোন্ কারণে কোন্ মাত্রার গেলা, তাতে কিছু আসে যায় না। ঐ ২০ কোটির মধ্যেই ঘুরবা আর কি, একমাত্রা সব সময়ে থাকে না। মৃত্যুর সময়ে মানুষের মাত্রা মানুষের থাকবে, তা থাকে না।** দেখা গেল, এমন আছে, মাছ লইয়া আইতাছ, (আসছো) গঙ্গার ইলিশ, তোমারই relative-এর মধ্যে একজন পড়ে গেল। মাছের চেহারা পাইয়া গেল।

মনে কর, ঠাকুরদাদা বা কোন আত্মীয় স্বজন, আরে এতো অমুকের 'জ্যাঠা' ইলিশমাছের মধ্যে দেখতে পাইলা। সেই ইলিশমাছ খাইতে ইচ্ছা করবো? খুব ভেজেভুজে খাইতে যাইতাছ। কারে ভাজতাছ? কারে খাইতাছ? কিছু ধরতে পারবে না। কিছু রক্ষা করতে পারবে না। এই মাত্রায় মাত্রায়, ছকে ছকে সব চলছে। সৃষ্টিটা কি, প্রকৃতি কি, এত সহজ? সব দান করতাছে এমনি এমনি? ইনক্লাব, জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম্, এইগুলি কবে যাইব গিয়া সব পরিষ্কার হইয়া?

প্রশ্ন ঃ ঠাকুর, আমরা কিভাবে চলবো?

ঠাকুর ঃ সেই বুঝ বুঝে ঐ মাত্রা মতন চলবা। আদেশ মতন চলবা। যেভাবে আদেশ করবো, আদেশ মতন চললেই একমাত্র লাইন মতন চলতে পারবা। কারণ মনে রাখবা, পাহাড়ের গায়ে মাত্র আধহাতও রাস্তা নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে দিয়ে চলতে হবে। পইরা (পড়ে) গেলে ৪ মাইল নীচে গভীর খাদ। বাঁদিকে পাহাড়টায় ছোট্ট একটু রাস্তা। একটু অন্যমনস্ক হইলেই বাস্। এইভাবে তোমাগো চলতে হবে। গভীর সতর্কতার সঙ্গে চলবা। তা নাইলে উপায় নাই। এইখানে বাহাদুরি করলা, ঐখানে আরেকজন দেবতা সাজতাছে, মহাপুরুষ সাজতাছে। সব সাজাসাজি শেষবেলা বিড়াল আর ব্যাঙ ছাড়া আর কিছু না। ঐগুলির কোন দামই নাই, সব সাজাসাজির খেলা।

আমি এইসব ঠাকুর ঠুকুর বনতে চাই না। এখানকার এই ঠাকুর আমি হইতে চাই না। যেই ঠাকুরের ঠাকুরত্ব থাকবে না, ভগবানের ভগবত্তা

থাকবে না, সেখানে এইসব সাইজা লাভটা কি? সব দুদিনের খেলা। আমি চাই স্বচ্ছ পবিত্র জীবনধারা। তাতে মানুষ ছ্যাপ (থুথু) ছিটাক গায়, নিন্দা করুক, অপরে যা খুশী তাই বলে বলুক। কিন্তু আমার সত্য থেকে আমি এক মুহূর্ত্ত সরে যেতে রাজী নই। এখান থেকে তো চলে যেতেই হবে। আর কত বছর? ৬০/৭০/৮০ বছরের শেষ সীমানা এখানে। তার জন্য এই মোহ এই সুখের লালসা করাটা বৃথা ছাড়া আর কি বলতো? যদি সেই ক্ষণিকের সুখের বুঝ বুঝতাম, তাইলে এই প্যারাশনি আমি পোহাইতাম না। আমার এত নিন্দা অপবাদ নেবার কোন প্রয়োজন হতো না। এত আঘাত নেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন দেখতে পাচ্ছি, এই প্ল্যাটফর্মে এতরকম ঝঞ্ঝাট ঝামেলা যে, নিজেকে উদ্ধার করতে হলে, নিজেকে বাঁচতে হলে প্রকৃতির এই সুরের মাধ্যমে যদি নিজেকে ছেড়ে না দেওয়া যায়, তবে আর মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার কোন পথ নাই। **মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে হবে, সব মাত্রা। এই ২০ কোটি মাত্রা না ছাড়ানো পর্যন্ত এই ছকে, এই লুডো খেলার প্যাঁচে সবার পড়তে হবে; এই ছকে সবার পড়তে হবে।** মই দিয়া ৯৮-তে উঠছে, বুঝলা? আবার ৯৯-তে সাপের মুখে পইড়া একেবারে লেজে আইসা পড়ছে ২-এ। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পথে যাইতে চায় না। এরকম হাবুডুবুর পথে ইচ্ছা কইরা কেউ যায়? আমরা সবাই যাচ্ছি, তোমরা সবাই যাচ্ছ জেনেশুনে। প্রকৃতি তোমাকে না জানিয়ে কোন কাজ করেন না। সব কিছু জানিয়ে শুনিয়ে করেন। **আর অপরাধের মাত্রা বাড়াতে যেও না। অপরাধের বোঝা পাহাড় সমতুল্য হয়ে গেছে। ধাপার স্তূপ হয়ে গেছে। এই অপরাধের হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যদি স্বচ্ছ পবিত্রতায় নিজেকে ঢেলে দাও। মনের মধ্যে বৃত্তি অনেকরকম খোঁচাখুঁচি করবে। মনের বৃত্তি আসবে। কাম বল, ক্রোধ বল,সব আসবে। আসলেই যে যেতে হবে, তার কোন কথা নাই। দমন করে দাও। মেঘ আসলেই কি বৃষ্টি হয়? আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আবার সূর্যের তাপে সেই মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।** অনেকসময় মেঘাচ্ছন্নভাব আসবে এবং তা সুন্দর সূর্যকেও ঢেকে রাখতে চাইবে। তোমাদের ভিতরে সেই জ্ঞানসূর্যকে ঢেকে রাখবার জন্য মেঘ আচ্ছন্ন করে রাখবে। কিন্তু সূর্যেরই কৃপাতে, সূর্যেরই উদার মনোবৃত্তিতে সেই মেঘের জল শুষে মেঘকে

সরিয়ে দিল। সুতরাং তোমরা ভিতরে এরকম মেঘাচ্ছন্ন হবে, মেঘে আবৃত করবে। কুয়াশাচ্ছন্ন হবে এবং সূর্যের মহাদানে আবার পরিষ্কার হয়ে যাবে। কুয়াশা আসবে মাঝে মাঝে; কিন্তু যাই আসুক, মাত্রা ছাড়িয়ে যেও না। মাত্রার মধ্যে আদেশের মধ্যে থেকো। এমন মাত্রায় তোমরা চলবে, যে মাত্রা এইসব মাত্রার ঊর্দ্ধে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

পৃথিবীর বয়স হয়ে গেল কত কোটি কোটি বছর। কত কোটি কোটি জীবজন্তু পৃথিবীতে আসছে, যাচ্ছে, বিচরণ করছে। কিন্তু সদাসর্বদা আঘাতের পর আঘাত আসছে; ঝামেলার পর ঝামেলা আসছে। আর আমরা এই ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে মুক্ত হতে পারছি না। কিন্তু মুক্ত আমাদের হতেই হবে। যাদেরে নিয়ে বাস কর, একটাও তোমার থাকবে না। স্ত্রী না, পুত্র না, বাবা না, মা না, কেউ থাকবে না। যেখানে মুহূর্ত্তের বিশ্বাস নাই, সেইসব নিয়ে আমরা খেলা করছি। যেখানে মুহূর্ত্তের বিশ্বাস নাই সেই খেলার দাম আছে? কোন দাম নাই। সব সাময়িক, সময় কাটানোর ব্যবস্থা এগুলো। সময় কাটছে না। আর আমরা এগুলো নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছি। আজ বাচ্চার অসুখ, কাল মায়ের অসুখ, বাবার অসুখ, করে যাও কাজ। এগুলো সব সময় কাটানো। এগুলো আসল বস্তু নয়। আসলের খেলা নয়। তোমার নিজেকে নিজে সংযত করার জন্য এইসব বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। তোমার সাহায্যকারী হিসাবে এগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তোমাকে কিভাবে বাঁচতে হবে, এগুলি তার পথ বাতলিয়ে দেয়। আবার কখনও কখনও ডুবতেও খুব সাহায্য করে। এমন সহজভাবে ডুবিয়ে দেবে, তুমি বুঝতেও পারবে না। আবার উঠতেও এগুলি সুবিধা করে দেয়। সুতরাং কঠিন সমস্যা।

অমুকে মহাপুরুষ, অমুকে অবতার— ওগুলি মুখে মুখে বললে চলে না। ঐসব মুখে মুখে যে অবতার, তাকে হয়তো দেখা গেল ছকের প্যাঁচে ছুঁচো হইয়া ঘুরতাছে। এক অবতার ছুঁচো হইয়া রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করতাছে। নামধারী অবতার হ'ল স্টেজের অবতার। স্টেজে কত অবতার আছে, থিয়েটার যাত্রায় দেখো না। তার মধ্যে একজন তার পার্ট হইয়া গেছে। এখন চানাচুর বিক্রী করতাছে। আর থিয়েটারের মঞ্চে চলছে কৃষ্ণ, রাম, গোবিন্দের খেলা। রামের খেলা থিয়েটারে যেই শেষ হইয়া গেল, সে চানাচুর

বিক্রী করতাছে। এখানকার বেশীরভাগ মহাপুরুষ এই করতাছে। কোন দাম নাই।

মাত্রা যা আছে, সেই মাত্রার উর্দ্ধে উঠতে হবে। তা নাহলে এখানে আর বাঁচবার কোন পথ নাই। তাই আমি যেভাবে যতটা বলি, পাঁচবছর বয়স থেকে, বাচ্চা বয়স থেকে, আমি এইপথে আছি— আমি যেটুকুনু পেয়েছি, সেইভাবে সেইটুকুনু নিয়ে যদি চলো, তাহলে তোমরা তোমাদের বাঁচবার পথে বাজীমাৎ করে যেতে পারবে। তা নাহলে একেবারে লুডোর ধাঁধাঁয় পইরা, ছকে পইরা ওঠানামা করতে হবে। আসলে আর পৌঁছাতে পারবা না কোনদিন।

আমি এখন বয়সের সীমায় পা দিয়েছি। এখন যারা দীক্ষা নিচ্ছ, আমি সেই সুরের পথের পথ দেখিয়ে যাচ্ছি মাত্র। তোমরা সেই পথের পথিক হইয়া চলো। সমাজকে রক্ষা কর, জাতিকে রক্ষা কর। নিজেকে বাঁচাও। এছাড়া অন্য পথে কেউ বাঁচতে পারবে না। স্বচ্ছ পবিত্রতার ভিতর দিয়ে নিজে নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

লক্ষ কোটি জীবের শক্তি তোমার মধ্যে বিদ্যমান; প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান

২০শে জুন, ১৯৮১
সুখচর ধাম

তোমরা যে শূন্যে রয়েছ, শূন্য থেকেই সৃষ্ট হয়েছ, বুঝতে পারছো তো? চোখে দেখছো, কানে শুনছো। চোখ নিজে দেখে না কিন্তু। অথচ চোখ দিয়েই দেখতে পাচ্ছ। তাহলে, কে যে দেখে, তাকে খুঁজে পাচ্ছ না। এই ঘ্রাণ যে পাচ্ছ; সত্যি সত্যিই কে যে ঘ্রাণটা পাচ্ছে, তাঁকে খুঁজে পাচ্ছ কি? পাওয়া যায় না। এই-ই চলেছে শূন্যের খেলা। কে দেখতে পাচ্ছে? তাঁকে খুঁজে পাচ্ছ না। কে শুনতে পাচ্ছে? তাঁকে খুঁজে পাচ্ছ না। রিসার্চ করে করে যে দেখছে, সে বললো, 'এই যন্ত্র হ'তে সেই যন্ত্রে বাতাসে বাড়ি খায়, তারপর ঐ যন্ত্র হ'তে এই যন্ত্রে বাড়ি খায়।' বলে তো গেল। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে, কে করছে? ধারাবাহিকভাবে এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে শ্রবণ ক্রিয়া হয়ে চলেছে, কে তার কারিগর তাঁকে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছ না। কে স্বাদটা পাচ্ছে? তাঁকে খুঁজে পাচ্ছ না। কিভাবে স্বাদ পাচ্ছে? এই স্বাদটা (টক, মিষ্টি, ঝাল, নোন্‌তা) কে বুঝছে? বুঝতে পারছো না। সমস্ত গ্রন্থি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললেও কিছুই খুঁজে পাবে না। অদ্ভুত ব্যাপার।

কোনও বিষয়বস্তুই খুঁজে পাবে না। এই যে সব কাজকর্ম চলছে। আমি খাচ্ছি, চলছি। আমি উপলব্ধি করতে পারছি; আমি শুনতে পাচ্ছি। আমার ভাল লাগে; আমার আনন্দ হয়; এইরকমে তোমার চিন্তাধারাকে খুঁজতে গেলে কিছুই পাবে না। ফাঁকা থেকে যে এসেছো, তার ইঙ্গিতটা **প্রতিমুহূর্তে তোমার এই দেহযন্ত্রের ভিতরে খেলে যাচ্ছে। এই সামান্য ক্ষুধার থলিটার (উদর) কথাই চিন্তা করে দেখ। খেয়েই যে যাচ্ছ, এই**

উদরটাকে কোনদিন ভরতে পেরেছ? ভরতে পারবে? পারবে না। এই ইন্দ্রিয়গুলির (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) মধ্য দিয়ে ক্ষুধার (চাহিদার) যে হাহাকার, তার কোনটাই ভরতে পারবে না। শূন্যেরও একই ধারা। এসব তো শূন্যেরই activities হচ্ছে। শূন্য হ'তে যে বস্তুগুলো এসেছে, সেগুলি সবসময় শূন্যকে পরিপূর্ণ করতে চাইছে। পরিপূর্ণতার tendency ঐ শূন্যেই, শূন্য থেকেই, শূন্যের মধ্যেই। শূন্যকে পরিপূর্ণ করার জন্য যে কামনা, বাসনা, আকাঙক্ষা— সেটাই 'কাম'। সমস্ত Universe (ইউনিভার্স) সেই কামনার fulfilment-এ রয়েছে। তাই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যার যার Orbit-এ (কক্ষপথে) থেকে আবর্তনে বিবর্তনে চলছে। তাতেই সব, সবাই পরিবর্তনের পথে পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে। হুঁ....হুঁ....হুঁ এ যে কি খেলা। অনন্ত সৃষ্টির অপার রহস্যময় খেলা। এই খেলা চলেছে প্রতিনিয়ত।

কী খেলা? নতুন বেড়িয়েছে নাকি? এ কি গ্রহ? না, বেলুন? না, স্পুটনিক? না, ক্রেন (crane)? এটা কি? সাংঘাতিক অবস্থা। পৃথিবীর তুলনায় ছোট্ট এক জিনিস। কতোটুকু? এই যে আবর্তনে বিবর্তনে চলছে গ্রহগুলো, তা কি without motive (উদ্দেশ্য ছাড়া)? না; without ambition কোন কাজ কেহ করতে তো পারবে না। এটাই হ'ল Nature-এর instinct; তার fundamental law। জীবদেহের একটি লোমকূপও cause (কারণ) ছাড়া নয়। এই যে ভুরুটা দেখছো, জল যাতে এমনি করে এসে এভাবে গড়িয়ে পড়ে, সরাসরি চোখের মধ্যে জল না পড়ে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। কী তার setting; অপূর্ব setting। কানের মধ্যে দেখ, এত কারিকুরি কেন? যাতে সরাসরি কানের মধ্যে বাতাস না ঢুকতে পারে, তারজন্য ঐ কারিকুরিগুলো। দেখছো, সৃষ্টির প্রারম্ভেই কেমন চিন্তা, কেমন বিচার? 'এখানে ধুলো আসতে পারে', 'বাতাস বাড়ি খেতে পারে', 'জল আসতে পারে' ইত্যাদি। **তখন তো পৃথিবীর বুকে এসব সৃষ্টিই হয় নাই; সেই এক আগুনের গোলা ছাড়া কিছুই তো ছিল না। তবে তো তাঁর সৃষ্টির ফর্মূলা বহু বহু আগে থেকেই যেন তৈরী করা ছিল; পূর্ব হতেই যেন set করা ছিল। কেন না, দেখা যাচ্ছে, প্রতিমুহূর্ত্তে এই-ই সত্য; অপূর্ব!**

শুধু 'অপূর্ব' বলে শেষ করা যায় না। প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, ''তুমি শূন্যের পথিক, শূন্যের যাত্রিক। তুমি শূন্য হ'তে এসেছ, শূন্যেই লীন হয়ে যাবে।'' ঐ যে প্রতি step-এ step-এ তোমায় জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু খুঁজে না পেলেও, খোঁজের মাঝে রয়ে গেছে সে। তাঁকে খুঁজে পাচ্ছ অনুভবে, অনুভূতির ভিতর দিয়ে। পাচ্ছ বিবেকের ভিতর দিয়ে, সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে, আশা-আকাঙক্ষার ভিতর দিয়ে। এই যে আশা-আকাঙক্ষার কামনা বাসনা চলছে, তার ধারায় সবাই কিন্তু চলেছে। তোমরাই শুধু নও। সে বাসনার স্রোতের ধারায় fulfilment বা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে জীবকুল এই সাধনার পথে। ''রূপ'' আবার নব নব রূপে রূপান্তরিত হতে হতে চলেছে। বিভিন্ন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন সৃষ্টির ধারায় সৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। একটা মানুষে কত মানুষ সৃষ্টি করছে। এই অনাদি অনন্ত সৃষ্টির, এই বিরাটের বিরাটত্ব এটাই। এই মহাশূন্য, এই অসীম; তার অসীমত্বের ইঙ্গিত, এটাই। একটা মানুষ যে বীজটা বহন করছে, তার কথা ভেবে দেখেছো? তুমি একটা মানুষ, তোমার সারা জীবনের বীর্য যদি রেখে দেওয়া যায় একত্রে; তবে ঐ একটা মানুষের বীজের ফসল বহন করতে কয়েকটা পৃথিবী লাগবে। বুঝতে পেরেছ? একটা ইলিশ মাছের ডিমে কত লক্ষ লক্ষ বাচ্চা থাকে। একটা মাত্র ইলিশমাছের খইলতার ডিম সহজভাবে রেখে দিলে নদীই ভরে যাবে। বোঝ, চিন্তা কর, ভেবে দেখ, সামান্য একটা ইলিশমাছের মধ্যে কতো। একটা মানুষের মধ্যেও তাই। একটা গাছের মধ্যেও তাই। বীজের উদ্দেশ্যই অনু অবস্থা থেকে বিরাট অবস্থার দিকে এগোনো।

এখন ভাবো তো, **আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের meditation-টা কি? আমাদের সাধনাটা কি? তা হচ্ছে, আমাদের Natural course-এ এগিয়ে যেতে হবে। পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে গিয়ে চলার পথে চলতে থাকাই আমাদের সাধনা।** যেভাবেই হোক এগোনো, সেভাবেই করতে হবে। তা সে হামাগুড়ি দিয়েই হোক, চার পায়েই হোক, তিন পায়েই হোক, আর যেভাবেই হোক। এখন ঐ হামাগুড়িটা কি? সাধনার পথে চলার চেষ্টা; প্রথম পদক্ষেপটাকেই বলতে পার। ঐ পথটা কি? পথটা হচ্ছে তৃপ্তির পথ, satisfaction-এর পথ। ঐ পথেই সাধনা করা হয়ে

যায়।

শূন্যমার্গে সাধনপথের সাধনাতে কোন দেবদেবতার বালাই নাই। ঐ ফাঁকা 'নাই' থেকে 'হ্যাঁ'-এর মধ্যে আনছে। তোমাদের দেবদেবতা তো নাই। 'নাই'-এর সাধনা করে করে এগিয়ে যাচ্ছ তোমরা। কি হবে তোমাদের ঐ দেবদেবতায়? তাদের ঘর সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, সব আছে। তোমাদেরও আছে প্রেম ভালবাসা, ঝগড়া-বিবাদ। তবে? দেবদেবতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তোমরা 'নাই'-এর সাধনা করছো। তার বিষয়বস্তুর Introduction (ভূমিকা) থাকে না? ইঙ্গিত থাকে না? পূর্বাভাষ থাকে না? পূর্বাভাষ কি বলছে? পূর্বাভাষ আভাস দিচ্ছে, তোমরা শূন্য হতে এসেছ। প্রতি লোমকূপে, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে শূন্যেরই সঙ্গীত বাজছে। মহাশূন্যের মাঝে অসীম অনন্তের সুর প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করতে পারতে যদি অন্ততঃপক্ষে এই চিন্তায় থাকতে যে, 'আমরা মহাশূন্যের পথিক', 'মহাশূন্যের যাত্রিক'। এই দেহবীণাযন্ত্রে কে যে দেখে, কে যে শোনে, কে যে বোঝে একটাও যখন খুঁজে পাওয়া যায় না; অথচ হয়ে হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতে পারছো তো?

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক— এই ইন্দ্রিয়গুলির দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদগ্রহণ, স্পর্শানুভূতি প্রভৃতি কাজগুলি যখন হয়ে হয়ে যাচ্ছে; আর শূন্য থেকেই যে হয়ে যাচ্ছে, এটা না মেনে উপায় নেই। সেইজন্যই বলতে হবে, এই যে 'হওয়া'টা, যাকে 'হ্যাঁ' রূপে অভিহিত করা যায়, সেটা তো শূন্য হতেই, 'নাই' থেকেই হচ্ছে। সুতরাং তোমরাও সেই বংশেরই। কিন্তু যাকে ধরতে পারো না, সে থাকে কি করে? এতো যে কাজ করছো, এত দৌড়াদৌড়ি করছো; তারপর? তারপর কি? তারপরও তো তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

জিহ্বাকে বলো, 'কে স্বাদগ্রহণ করে?' কি উত্তর দেয়, দেখো। জিহ্বা বলবে, 'জানি না তো।'

কানকে জিজ্ঞাসা করো, 'কে শোনে?' কান উত্তর দেবে, 'জানি না তো'।

চোখকে বলো, 'কে দেখে?' চোখ ঐ খোঁজাখুঁজির উত্তরে বলবে,

'জানি না তো'।

কিন্তু কাজগুলি সব হয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর নিপুণভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির মাঝে বুঝতে তো পারছো, কাজগুলি কেমনে যেন হয়ে যাচ্ছে।

যদি ঐ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের, চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসা করো, তারা গম্ভীরভাবে জবাব দিতে থাকে, শব্দতরঙ্গ এখানে ঐ পর্দায় বাড়ি খায়। তারপর ওখানে ঐ পর্দায় গিয়ে ধাক্কা মারে, ইত্যাদি; আরও কত কি বলে। ব্যাস্। এতে কি হলো? Body-র Research কি সম্পূর্ণ হলো? Anatomy কি বলে? Anatomy-টা রয়েছে কোথায়? ওরা যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টায় বলে চলে, এই যে এখানে শব্দটা বাড়ি খায়। তারপর ঐ ঐদিকে গিয়ে ওরকমটা হয়। বোঝাবার চেষ্টায় এরকমভাবে বলে চলে। কতো যে বোঝানোর চেষ্টা। ওরা বুঝিয়ে দিলেও তুমি বুঝতে পার না। কি করে পারবে? কি করে যে সবকিছু হচ্ছে, তুমি তো নিজের বুঝে আনতেই পারছো না। কে যে বুঝগুলিকে বুঝছে, তাকে তুমি চিনে নিতে পারলে না। খুঁজে পাচ্ছ কি? সেই ব্যক্তিটা কোথায়? তাঁকেই অর্থাৎ ঐ **সবকিছুর যিনি কারণ, তাঁকেই যদি ধরে রাখতে না পারলে, চিনে রাখতে না পারলে, তাতে লাভটা কি হল? তুমি তাঁকেই কিন্তু ভিতরে বহন করে চলেছো, তুমি তাঁরই বাহক হয়ে যাচ্ছ; তোমার Body-টার ভিতরে তাঁকেই নিয়ে চলেছ; অথচ তাঁর নাগালই ধরতে পারছো না। তাঁরই দৌলতে বহু শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, বহু ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, বহু অনুভবে মণ্ডিত দেহরূপী যন্ত্রটি হয়ে আছে, যাতে কি বা নেই?** অর্থাৎ সমস্ত শক্তি এতে (দেহযন্ত্রে) অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। এতে সবই আছে। বুদ্ধি বিবেচনায় conscious হয়ে, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তি, সবই বহন করছো? সবে মিলিয়ে উপলব্ধি করছো।

তবু যখন তুমি একটা মূর্ত্তি বানাচ্ছো, সেই মূর্ত্তি কিন্তু সাড়া দেয় না। অমন সুন্দর চোখ যে এঁকেছো, যাকে দেখলে মনে হয় ঐ চোখ বুঝি সত্যিসত্যিই দেখতে পায়; কিন্তু তার সাথে ''চোখে চোখে'' যে কথা বলা, সে তো আর বলতে পারছো না। সে তো মূর্ত্তি হয়েই রইলো। সবই ঐ

রকম। তোমার মাঝে যে চৈতন্যস্বরূপ, তোমার সর্ববিধ কার্যের যে নিয়ন্তা, তাকে তো খুঁজেই পাচ্ছ না। খোঁজের মাঝে সে নিখোঁজ হয়েই আছে। এখানেই হ'ল ফাঁকার কেরামতি। ফাঁকা হ'তে এসেছ তো বললে। সৃষ্টির মধ্যে ফাঁকার কেরামতিটা দেখো।

ফাঁকার কি উদ্দেশ্য? সে কি বলে বলে দিচ্ছে না যে, ''এভাবে কর, ওভাবে কর।'' সৃষ্টিটাই এজন্য যে, তুমি যেন ওকে বোঝ, সেও যেন তোমাকে বোঝে। এই বোঝাবুঝির ভিতর দিয়ে তোমার ব্যবস্থা তুমি করো। **রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেমন Arrow (নিশানা) লাগানো থাকে; লোক থাকে না, জন থাকে না সাহায্যের জন্য Arrow দিয়ে দেয়। ঐ Arrow মার্কটা (চিহ্নটা) নির্জন মধ্যরাত্রেও চিনিয়ে চিনিয়ে দিচ্ছে, "এটা দিল্লী রোড", "এটা বম্বে রোড", তাই না? ব্যক্তি তো নাই। কিন্তু Arrow-র সাহায্যে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। আমাদের জীবনে চলার পথেও এরকম Arrow আছে। সমস্ত জীবজগতের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য ঐরকমেই Arrow বা পথ নির্দেশক।** এই বিচারবুদ্ধির অভ্রান্ত arrow আমাদের জীবনের সর্বত্র তার কাজ করে চলেছে। তুমি দেখো, পৃথিবীতে এত কোটি কোটি লোক, কারও চেহারার সাথে কারও চেহারা কি মেলে? না, কারও গলার স্বরের সঙ্গে কারও স্বর মেলে? না, মেলে না। একদিকে দশ হাজার মা, আরেকদিকে দশ হাজার বাচ্চা; এদের যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে, বাচ্চাগুলো যার যার গলায় এ্যাঁ, এ্যাঁ করছে, আর তার তার মা সাড়া দিয়ে চলেছে। এই পরম বিস্ময়কর সম্ভাবনাটা বীজ আকারে কোথায় রাখা ছিল? এই 'ফাঁকা' তাহলে সূক্ষ্মের কত বড় শিল্পী, চিন্তা করে দেখ।

এই পৃথিবী থেকে আজ অবধি কত লক্ষ কোটি লোক চলে গেছে। অন্য জীবের কথা বাদই দিলাম। তাদের কারও চেহারার সঙ্গে কারোর চেহারার হুবহু মিল ছিল? ছিল না। তাহলে সে (ফাঁকা) কত বড় Artist, যার দৌলতে এই ফাঁকাকেই আমরা Artist বলছি। এত জীবজন্তু, এত কোটি কোটি জীব যে রয়েছে, তাদেরও কোটি কোটি চলে যাচ্ছে অনন্ত গতির ধারায় গতিশীল হয়ে। আমাদের এই কার্যকলাপে, গতিবিধি দিয়ে

এত রূপের বর্ণনায়, এত শক্তির মহিমায়, ছন্দে বৈচিত্র্যে সবে মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় রূপ। ফাঁকার বর্ণনা নেই। অথচ এই ফাঁকার মধ্যে কত বর্ণ, কত যে রূপ; তাকে আখ্যায় ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা চলে না, রূপেরও বর্ণনা করা চলে না। পৃথিবীতে এত কোটি কোটি লোক। প্রত্যেকের স্বর বিভিন্ন; এটা কম কথা নয়। বিভিন্ন যে স্বর, সেই স্বরগুলিকে যদি আমি সুর বলি, তাহলে দেখ, কত যে সুর; তা ভাবাতীত; ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বুঝতে পেরেছ? এতো স্বরই বা কি করে সম্ভব? হ্যাঁ, ফাঁকার পক্ষে সবই সম্ভব। ফাঁকার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ফাঁকার বর্ণনা বোঝাবার জন্য নয়। ফাঁকার বর্ণনা অবর্ণনীয়। যা দেখতে পাচ্ছ, সবই তাঁর রূপ। তাই ফাঁকা সর্বত্র। রূপ বল, বিবেক বল, বিচার বল, বুদ্ধি বিবেচনা সর্বত্রই তাঁর নির্দেশনা। ঐ নির্দেশগুলির উপরে Arrow-গুলোকে দেখ।

জীবের মাঝে রয়েছে সহজাত বৃত্তি। চিনির কৌটা কোথায় আছে, পিঁপড়া তাকে খুঁজে বের করে। তোমার নাসিকায় তুমি খুঁজে পাচ্ছ না। অথচ ওর মধ্যের ইঙ্গিত তোমাকে কত সত্যের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। **এই জগতে লক্ষ কোটি রকমের জীব আছে। এই লক্ষ কোটি জীবের প্রত্যেকটির শক্তি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। একটি ব্যক্তিতে লক্ষ কোটি জীবের শক্তি। তাহলে তুমি কতবড় শক্তিমান।**

কাঁঠালটা ভাঙার সাথে সাথে মাছি এসে উপস্থিত হয় না? আমি পদ্মা নদীর মাঝে বাবার সাথে যাচ্ছি। মাঝি ছিল জলধর। আমি জলধরকে বলছি, ''জলধর, আমাদের দেশে পদ্মানদী খুব বড়। এপার ওপার তো দেখাই যায় না। অথচ দেখ, এই যে আমি কাঁঠালটা ভেঙেছি, সবেমাত্র দু'চার সেকেন্ড হয়েছে। এর মধ্যে এই সবুজ 'সমুদ্রের' মাছি কোত্থেকে এল? কিভাবে এল? নদীটা পার হয়ে আসতে সময় তো লাগে। কিন্তু দু'চার সেকেন্ড; কি করে পারে? ঐখানে তার capacity আছে। সেটা practical. সেটা built in inborn। সেটা instinct. কাঁঠাল ভাঙার সাথে সাথেই আসছে। তুমি বাড়ীতে গিয়ে একটা কাঁঠাল ভেঙে দেখো। কিংবা ফজলি আম? নিজে দেখলেই বুঝতে পারবে।

সেই সাপের ঘটনাটা বলি। একজন একটা সাপকে ব্যথা দিয়ে এসেছে। একটা টেটা দিয়ে সাপটাকে মেরেছিল। আমার কাছে এসে জানিয়েছে। আমি তাকে বলেছি, 'ঐ কাপড় পরে শুবি না।' আমার কথামত সে ঐ কাপড় চোপড়গুলো খুলে এক কোণায় জড়িয়ে রেখে দিয়েছে। প্রায় ১৪ মাইল দূর থেকে পথ চিনে চিনে সাপটা ঠিক এসেছে মধ্যরাত্রে। ঘ্রাণে ঘ্রাণেই ধরে ধরে এসে কাপড় চোপড়গুলিকে পেঁচিয়ে ধরেছে সে। অবশ্য তার গলায় ভাঙা টেটার ঠকঠক শব্দে বাড়ীর সকলের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সাপটাকে ধরে মেরে ফেলে। এই ঘ্রাণের instinct বিভূতির মতো। এরকম লক্ষ কোটি জীব যে আছে, তাদের প্রত্যেকের power সবই কিন্তু তোমার মধ্যে আছে। বুঝতে পেরেছ?

একটা জীবের কত gland আছে? অনেক, লক্ষ লক্ষ gland আছে। মনে কর, হয়তো ৫০০টা gland ফুটেছে। বাকী সবগুলো ফুটবার সময় পায়নি। ওগুলোতে মাত্রামতো 'তা' দিলে বা এতে temparature-টা যদি ঠিকমতো নিয়ে আসো, তাহলে একেবারে দেখবে, এক হাজার gland ফুটে গেল। ডিম অতি গরমে দিলে ফোটে না, আবার কম ঠাণ্ডায়ও ফোটে না। ঠিক ঠিক 'তা'-টির জন্য ঠিক ঠিক তাপের মাত্রাটা নিয়ে এসো। তাহলে দেখা যাবে, সকল জীবের মধ্যে যে দুর্বল gland-গুলো আছে, মনে কর, সেগুলি প্রায় ৫০০ কোটি। এই ৫০০ কোটি gland-এর কয়েকটি মাত্র ফুটেছে। বাকীগুলি ফুটছে না। ফুটছে না; কিন্তু ফুটতে পারে। ওদের যে thought, তাতেই ওদের ঐ 'তা'। সেই সমস্ত thought গুলি তোমার মধ্যে নিয়ে এসে যদি কার্যকরী করতে পার, তবে ঐ ৫০,০০০ gland যে ফুটবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। **যদি কারও ৫০,০০০ gland ফুটফাট করে ফুটে উঠতে থাকে, তবে তার পক্ষে অন্তর্যামিত্ব লাভ করা ও বিভিন্ন শক্তিগুলি জেগে ওঠাতে অসুবিধার কিছু নেই। আমাদের gland কয়টা বা ফোটে? কয়েকটি মাত্র। তাতেই চলাফেরা, কাজকর্ম করছো। আর সমস্ত gland-গুলি সেভাবে রস পায় না। ঐগুলি যদি ফুটিয়ে নিতে পার, তবে সমস্ত জীবের সঙ্গে connection হয়ে যাবে। সবকিছু বুঝতে পারবে; বুঝে নিতে পারবে; উপলব্ধি করতে পারবে।**

এটাই মনে করবে; এটাই মনে রাখবে। সৃষ্টির রহস্যে যখনই যেটা সহজভাবে থাকবে, তারজন্য তার ব্যবস্থা, বিধান বা উপায় একটা সঙ্গে সঙ্গেই না থেকে নয়, না দিয়েই নয়। বাচ্চা যখনই হয়, বাচ্চা যখনই মাতৃগর্ভে আসে, তার সাথে সাথেই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার আগে আগেই দুধের উপায় করা হয়ে থাকে। উপায় না করে, উপায় না দিয়ে সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে না। এটাই হলো শূন্যের খেলা। শূন্যের ঐ 'সুরে'র খেলা। তাতে এ ব্যবস্থাও আছে যে, যেখানে যেমন difficulties arise করবে, সেই সমস্তগুলো আমরা আমাদের নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধিগুলো দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করবো। কিন্তু পরিবর্ত্তে দেখা যাচ্ছে, আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে যে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তাই দিয়ে দিয়ে নিজেরা নিজেদের crusify করছি। এটাও Natural gift, প্রকৃতির মহাদান। **প্রকৃতি আমাদের স্বাধীন চিন্তাগুলো উইল (will) করে দিয়েছে। আমরা ইচ্ছেমতো তার প্রয়োগ করতে পারি। এখানেই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন।** যেখানে দরকার নেই, অপ্রয়োজনে সেটা বিষ হয়েও দাঁড়াতে পারে। যেমন, বিশেষ খাদ্যেও food poisoning হয়। ঐ poison-এ রূপান্তর হওয়ার ক্ষমতা খাদ্যের মধ্যেই আছে। ভালো না হয়ে, হ'লো উল্টো; হলো মন্দ। এক্ষেত্রে আমাদের gland গুলো poisoned হয়ে গেলে যেরকম হয়, তেমনই হয়ে আছে আর কি। **আমাদের কয়েকটা gland-ই যা ফোটা আছে। বাকীগুলো ফুটে ওঠার সুযোগই পাচ্ছে না। বদহজম হয়ে পেট ফাঁপার মতো অবস্থা। তোমাদের thought গুলো poisoned হয়ে গেলে gland গুলো কুব্যবহারে, অসদ্ব্যবহারে poisoned হয়ে যাবে।**

আমরা সারাদিন ধরে যে সমস্ত চিন্তা করি, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তার একটাও আমাদের body-র পক্ষে অনুকূল নয়, স্বাস্থ্যকর বা helpful নয়। বুঝতে পেরেছ? সব সময়ে একটা disturbed thought, disturbed mind নিয়ে আমরা রয়েছি। মনের মধ্যের সেই সহজ সরল সুস্থ প্রাণখোলা হাসি হারিয়ে গেছে। সেই শিশুর মতো অকপট হাসি কৈ? কোথায় গেল? কেন গেল? কারণ problem-এর পরে problem এসে আমাদের জীবনগুলিকে জর্জরিত করে তুলেছে। এখন এতশত জমানো problem-গুলোর সত্যিকারের সুষ্ঠ সমাধান করতে তো পারছোই না, উল্টে ফাঁকি দিয়ে,

বিবেকের নির্দেশ না নিয়ে, কৌশল করে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বা দায়িত্বের ঝক্কি কাটিয়ে চলছো। এতে তোমায় কোথায় নিয়ে গেল, তা খেয়াল করেছ কি? ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করো।

আমার যত কথা সবই Scientific। কোনটাই বিজ্ঞান ছাড়া নয়, Mathematics (গণিত) ছাড়া নয়। তবে সময় বড় কম। তাই শুধুমাত্র touch করে করে যাচ্ছি। তোমরা কিসের মধ্যে আছো, কি নিয়ে আছো, কোন্ পথে চলছো, তাই জানিয়ে দিচ্ছি। কতটা হওয়া উচিত, কীভাবে হওয়া উচিত, এসবই তোমাদেরকে জানিয়ে দেবে ঐ arrow. চৈতন্যেভরা বিবেকের নির্দেশনায় সুন্দরভাবে জাগাতে হবে ঐ gland গুলোকে। সেজন্য দেহবীণাযন্ত্রে সব ব্যবস্থা আছে এবং সেটা আছে সুন্দরভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে। **Gland-গুলোকে ঠিক করার জন্য এই body-র মধ্যেই sense-কে injection করা আছে। কি চমৎকারভাবে যে এরা কাজ করে না? সাংঘাতিক। Gland-গুলি ঠিক ফুটে উঠবে, যদি sense-এর সাথে মিলিয়ে, প্রকৃত অর্থের সাথে মিশিয়ে কাজ করতে পারো। Thought-টা যেন মাত্রার মধ্যেই থাকে; মাত্রা যেন না ছাড়িয়ে যায়।** Sugar যেমন বেরিয়ে যায় বলে Insulin Injection-এর মাধ্যমে ঐ মাত্রা বা Balance রক্ষা করতে হয় অনেক চেষ্টা করে করে, ঠিক তেমনি তোমার ভিতরের মাত্রার বেশী কমেতে Balance করে করেই দেহযন্ত্রটাকে গুছিয়ে রাখতে হবে। যখন তুমি বুঝতে পারছো তোমার ভুলটাকে, তাতেই যথেষ্ট। যদি ভুলটা বুঝাই যায়, তুমি যদি বুঝতে পার যে ভুল হচ্ছে, তখনই তোমার সংশোধনের পথ প্রশস্ত হবে। যখনই বুঝবে যে, 'আমি বুঝতে পারছি না', তখনই বুঝতে হবে যে, বুঝ সজাগ। বুঝ সজাগ না হলে কি করে বুঝছো যে, 'বুঝতে পারছি না'। যাক ঐ ইচ্ছাটা থাকলেই পথটা থাকে, কেমন?

তুমি হয়তো তিন, চার বছর ধরে একটা চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছো; হঠাৎ একটা ঠোঙার কাগজের মধ্যে পাওয়া গেল তার উত্তর, তোমার সমস্যার মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য। চারিদিক উত্তপ্ত হলেই তার fulfilment-এর জন্য যেমন ঝড় ছুটে আসে, তেমন তোমার যখন জানবার

আকাঙ্ক্ষা হবে, তখন জানাবার এমন সব উপায় জুটে যাবে চারিদিক হতে, তুমি চিন্তাও করতে পারবে না, কিভাবে সমাধানটা হয়ে গেল। কাজেই তুমিও দেখবে, সমাধান আপনিই হবে। এটা Instinct. আপনা থেকে হবে। অদ্ভুত!

সর্বদা ভাববে, 'আমি আমাকে জানতে চাই', 'আমি আমাকে বুঝতে চাই।' 'কেন আমার জন্ম হলো?' 'কোথায় আমি যাব?' এই আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, 'কিন্তু বিহীন' এই আকাঙ্ক্ষা যদি মনের মাঝে জেগে ওঠে, যদি কখনও এই ভাবনা স্বচ্ছ ভাবের মধ্যে জেগে ওঠে, তখন সব সমস্যারই সমাধান আসবে। অবশ্য তারজন্য অনেক ঘা খেতে হবে। অনেক অনেক আঘাতের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু হতাশ নিরাশ হয়ো না। তবেই হবে এই 'কিন্তু বিহীন' আকাঙ্ক্ষার পূরণ। জানার বস্তু 'জানা' হয়ে ধরা দেবে।

অথচ বাস্তবে দেখবে, একই অতৃপ্তির ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছ মৃত্যুর শেষ সময় পর্যন্ত। কোনও কিছুতেই এখানে তৃপ্তি পাবে না। পাবে আঘাতের পরে আঘাত। এদিকে তুমি ভিতরে ভিতরে পরম 'জানা'র পরম তৃপ্তিতেই রয়েছ।

এই ধারায়ই তোমরা অনুভূতির রাজত্বে বিরাজ করো। সিদ্ধি, মুক্তি নিয়ে ভাবতে হবে না। সহস্রধারায় ফুটে উঠুক, প্রকাশ হোক, ঐ বিন্দুনাদের ঘরে জাগুক সেই মহামিলনের সুর, যা জাগলে দেখবে, অবাধ আনন্দের ঝরণা।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
১০) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১১) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
১২) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১৩) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৪) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৫) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৬) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
১৭) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৮) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৯) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২০) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯৮৩১৬৩২৫৬৭
২১) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	প্রকাশকাল
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫